স্বদেশী সমাজ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ৩·০০ টাকা

স্বদেশী সমাজ

বর্তমান গ্রন্থের পরিপূরক

অন্যান্য গ্রন্থ

পল্লীপ্রকৃতি

সমবায়নীতি

স্বদেশ

ইতিহাস,

কালান্তর

সভ্যতার সংকট
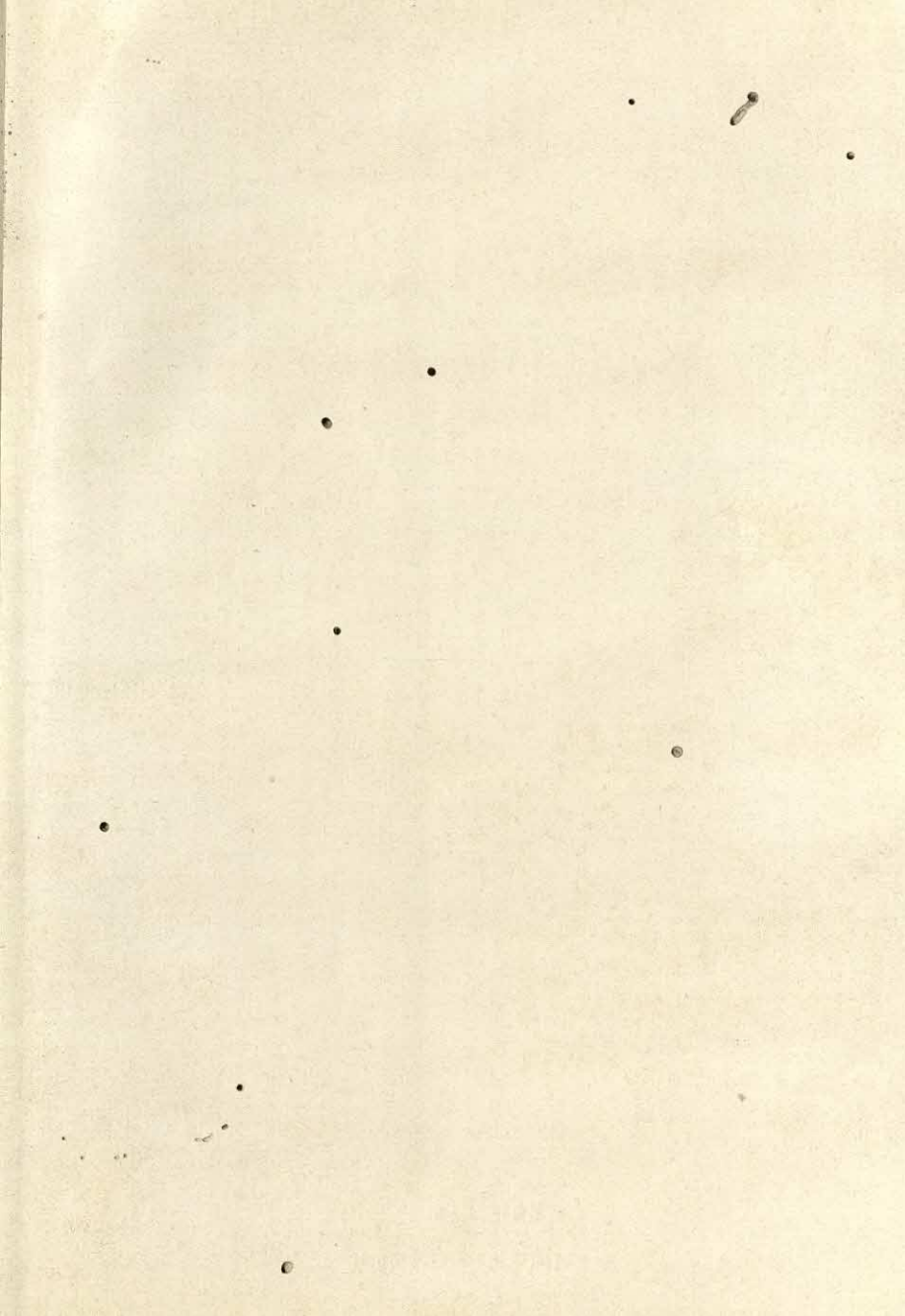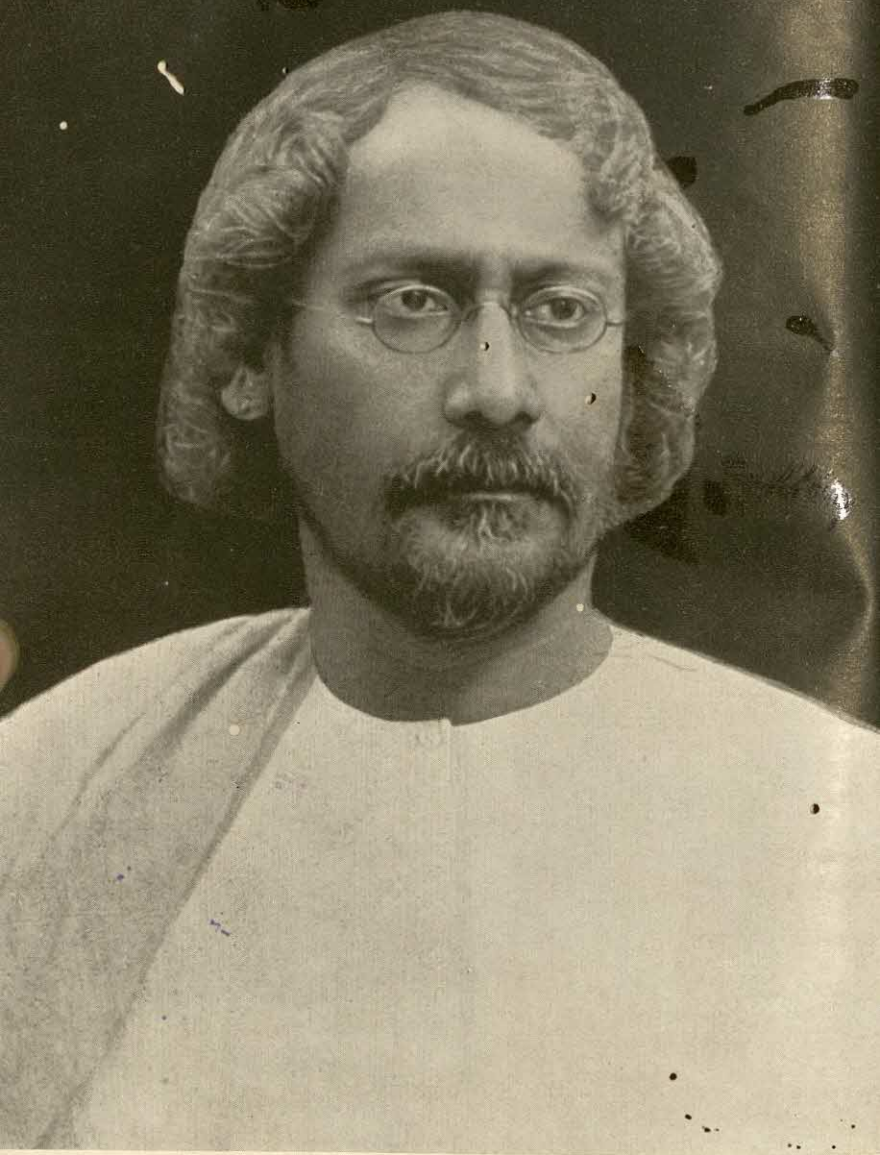
রবীন্দ্রনাথ

আনুমানিক ৪৫ বৎসর বয়সে

স্বদেশী সমাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

'যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আপন করে তুলতে হবে', এ বিষয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বারবার যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার কেন্দ্রবর্তী হইয়া আছে 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক যে-সকল রচনা ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত।

ইহাকে বিশেষভাবেই বিশ্বভারতী-কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের পরিপূরক -রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।
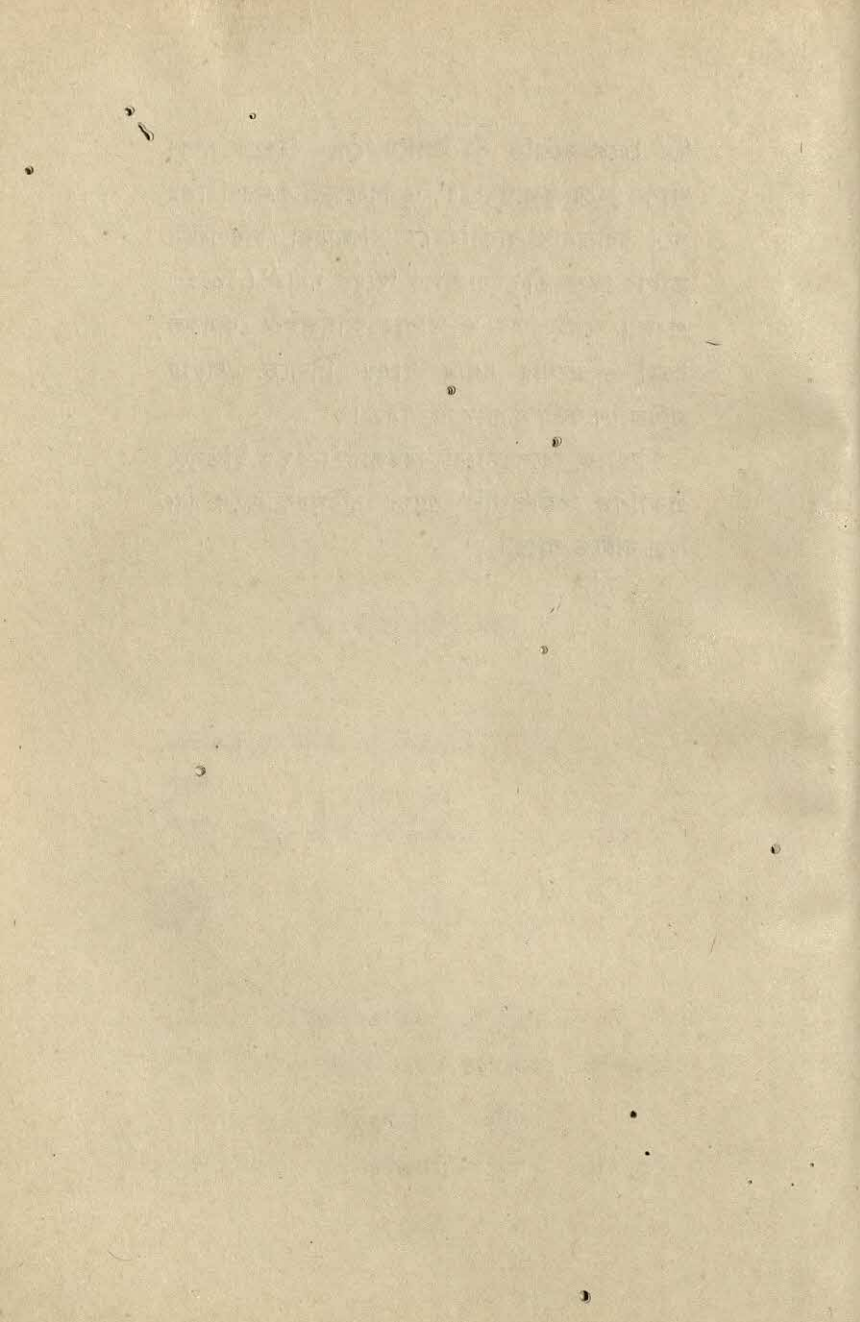
পৃষ্ঠা

চিত্র

রবীন্দ্রনাথ। আনুমানিক ৪৫ বৎসর বয়সে

মর্মকথা

...ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক্, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকারবাহাদুর-নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব-নিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই, এই রকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি— একে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি।...

আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারও নেই। দেশের 'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে। এই চিন্তা করেই একদিন আমি 'স্বদেশী সমাজ' নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর-একবার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে।

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত

শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা। গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল, লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না, কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে, যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ— সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে শূন্য অতিথি-শালায় উঠল অশথ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।

সকলের চেয়ে বিপদ হল এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু

চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান অন্নদান বিদ্যাদান সমস্তই সরকার-বাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত, সেইখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে, এ কথা বলাও যা, আর, আগে ধন লাভ হবে তার পর ছেলে মাকে স্বীকার করবে এ কথা বলাও তাই। দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলা উচিত— বস্তুত সেই অবস্থায় সম্বন্ধের দাবি বাড়ে বৈ কমে না। স্বদেশী-সমাজে তাই আমি বলেছিলুম ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না ক'রে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে, স্বদেশী-সমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

স্বদেশী সমাজ

বাংলাদেশের জলকষ্ট -নিবারণের সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

[২]আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই, কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে— আমাদের আম কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণীখনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতে-ছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই, এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।[২]

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে— তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ

আপন দীর্ণভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্ত-প্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়, সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই; তাহার জলাশয়গুলি দূষিত, পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই; সমৃদ্ধঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত, সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্তা সরকার-বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার-বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার-বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখা-প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। নাহয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই-সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী?

ইংরাজিতে যাহাকে স্টেট বলে আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি-আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে; ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন— যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না তাহা নহে; কিন্তু কেবল আংশিকভাবে, বস্তুত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা

যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না তাহা নহে, কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন, তাহারা কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে— তাহাদের সমস্ত বড়ো বড়ো কর্তব্য-ভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন, কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না— সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহা সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগ চর্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে— ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয় সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয় তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়, এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়,

তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর, আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত —এইজন্য ইংরাজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে, সচেষ্ট রাখিতে, জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরাজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি অবস্থানির্বিচারে গবর্মেণ্ট্‌কে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালোবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্মভার সাধারণের সর্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভালো, না তাহা বিশেষভাবে সরকার-নামক একটা জায়গায় নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিংক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ, এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে বিলাতরাজ্যের স্টেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না— অত্যন্ত ভালো হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকার-বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায়গ্রহণ করেন নাই।[৩]

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভুক্ত স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি।[৪] এ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাঁধিয়া গেছে— পরিবর্তন-মাত্রই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান, যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মর্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে— সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ নহে।

পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবেরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই

রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না— সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকার-দত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন— রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের গণ্ডগ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্ব-চর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই, কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে।[৫]

এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্ট-নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট্ দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন— স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল![৬]

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকো, বিদ্যা ও ধনমান -অর্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালি জাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে— তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে

উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহা যেন একেবারে উল্টা-পাল্টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।[৭]

ইহাতে আমাদের নানা কাজে যে কিরূপ অসংগতি ঘটিতেছে প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্‌স্‌ই তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। এ কন্‌ফারেন্‌স্‌ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরাজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছল-বল-কৌশল সাজ-সরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই।[৮]

পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু[৯] দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র

বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরমলাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্যকলাপে যে-সমস্ত চাল-চলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি সে-সমস্তকে দূরে রাখিয়া, দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে করো প্রোভিন্শ্যাল কন্ফারেন্স্কে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রাগান আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূর দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক কীর্তনগায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়, তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের

জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর— মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে— কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে, সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে— প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য, তাহার পরে এই-সমস্ত মেলা-গুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলা-গুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন করেন— কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া, বিদ্যালয় পথঘাট জলাশয় গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস— যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশের নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন— তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা

কীর্তন কথকতা রচনা করিয়া, সঙ্গে বায়স্কোপ ম্যাজিক-লণ্ঠন ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন— তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেকে মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারদের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন— তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা-দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে— ইঁহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইবে পারিবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণ -বশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি-ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না— সে স্থলে 'ইতরে জনাঃ' মিষ্টান্নের উপায় জোগাইয়া থাকে, কিন্তু 'মিষ্টান্নম্‌' 'ইতরে জনাঃ' কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না— ভোগ করেন 'বান্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-

সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত, বাংলার পল্লীদ্বারে আর একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে— তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্মের কাছে, অপরাধী হইব।[১০]

আমাদের দিশী লোকের সঙ্গে দিশী ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ হইতে পারে আমি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র এবং এই উপলক্ষটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কী করিয়া যে একটা দেশ-ব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে তাহারই আভাস দেওয়া গেল।[১১]

যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের সর্বপ্রধান মঙ্গলব্যাপার বলিয়া গণ্যই করেন না, তাঁহাদিগকে অন্যপক্ষে পেসিমিস্ট্ অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে

লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভ-দ্রাক্ষাগুচ্ছ-লুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি— পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ 'পেসিমিস্ট' আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না— আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি— আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতা-লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষ-ভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারি দিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ-স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা -নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্পর্ক রক্ষা করিতে হইবে— গুরু-পুরোহিত অতিথি-ভিক্ষুক ভূস্বামী-প্রজাবৃন্দ সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে, এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে, এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্র-স্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এই জন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালমন্দ দুই দিকই

থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন-কি তদপেক্ষাও বড়ো— ইহা প্রাচ্য।

জাপানযুদ্ধ ব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধ ব্যাপারটি একটা কলের জিনিস সন্দেহ নাই— সৈন্যদিগকে কলের মতো হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতোই চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক সৈন্য সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; তাহারা অন্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোন্মাদগ্রস্ত পশুবৎও নহে; তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত এবং সেই সূত্রে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট— সেই সম্বন্ধের নিকট তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্য আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত, রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্চ খেলার দাবাবোড়ের মতো মরিত না— মানুষের মতো হৃদয়ের সম্বন্ধ লইয়া, ধর্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট আত্মহত্যার মতো হইয়া দাঁড়াইত, এবং এইরূপ কাণ্ডকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন—'ইহা চমৎকার, কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে।' জাপান এই চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, এইরূপ আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ-দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং অনাবশ্যক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সংকীর্ণ; আপিসের মধ্যেই তাহার শেষ। প্রভুভৃত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে তবে কাজ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনোপ্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে পুত্রকন্যার বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ-

শান্তি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন। আমি রাজশাহী ও ঢাকার প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্‌সে উপস্থিত ছিলাম। এই কন্‌ফারেন্‌স্‌-ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের জিনিস বলিয়া মনে করি সন্দেহ নাই ; কিন্তু আশ্চর্য এই দেখিলাম ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই সুপরিস্ফুট। যেন বরযাত্রীর দল গিয়াছি— আহার-বিহার আরাম-আমোদের জন্য দাবি ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বানকর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাঁহারা বলিতেন 'তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই— এত চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়, এত শয়নাসন, এত লেমনেড-সোডাওয়াটার, গাড়িঘোড়া, এত রসদের দায় আমাদের 'পরে কেন', তবে কথাটা অন্যায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাঁকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে যত ভয়ংকর কেজো হইয়া উঠি-না কেন, তবু আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কন্‌ফারেন্‌সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই, আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কন্‌ফারেন্‌স্‌ তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারীগণ আহূতবর্গকে অতিথিভাবে আত্মীয়ভাবে সংবর্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম কষ্ট অর্থব্যয় যে কী পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যে অংশ আতিথ্য সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পূরা কাজ করে— যে অংশ কেজো,

তিন দিন মাত্র তাহার কাজ, বাকি বৎসরটা তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে সেবার সম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অনুশীলনের উপলক্ষ ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথ্য গৃহে গৃহে আচরিত হয় তাহাকে বৃহৎ-পরিতৃপ্তি দিবার জন্য পুরাকালে বড়ো বড়ো যজ্ঞানুষ্ঠান হইত— এখন বহুদিন হইতে সে-সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া যেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া জনসমাগম হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অব্যবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞ-ভাণ্ডারের মাঝখানে তাঁহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এমনি করিয়া কন্‌গ্রেস-কন্‌ফারেন্‌সের মাঝখানে খুব যখন বিলাতি বক্তৃতার ধুম ও চট্‌পটা করতালি, সেখানেও, সেই ঘোরতর সভাস্থলেও আমাদের যিনি মাতা তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন সকলকে, ভাঙিয়া, বাঁটিয়া, খাওয়াইয়া চলিয়া যান— আর যে কী করা হইতেছে তাহা তিনি ভালো বুঝিতেই পারেন না। মা'র মুখের হাসি আরও একটুখানি ফুটিত যদি তিনি দেখিতেন পুরাতন যজ্ঞের ন্যায় এই-সকল আধুনিক যজ্ঞে, কেবল বই-পড়া লোক নয়, কেবল ঘড়ি-চেন-ধারী লোক নয়, আহূত-অনাহূত আপামর-সাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত, কিন্তু আনন্দে মঙ্গলে ও মাতার আশীর্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধুর্যটুকু ভুলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে।

আমরা এই-সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে-পরে, উচ্চে-নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এই জন্যই এ দেশে টোল, পাঠশালা, জলাশয়, অতিথিশালা, দেবালয়, অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান জলদান আশ্রয়দান স্বাস্থ্যদান বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য ছিন্নসমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব? প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প, একমুষ্টি বা অর্ধমুষ্টি তণ্ডুলও, স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই— এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না? স্বদেশের সহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ, সে কি আমাদের

প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না? আমরা কি স্বদেশকে জলদান বিদ্যাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্মগুলিকে পরের হাতে বিদায়দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব? গবর্মেণ্ট্ আজ বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেছেন— মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না, তাহার ফল কী হইল? তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ কল্যাণলাভের সূত্রে দেশের যে হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে, সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি— কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে? এই জন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি ও এইরূপে দেশকে অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না। ইহা কখনোই চিরদিন এ দেশে প্রশ্রয় পাইবে না— কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। আমরা আমাদের অতিদূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই, তাহাদিগকেও নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি, আমাদের বহুকষ্ট-অর্জিত অন্নও বহুদূরকুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা একদিনের জন্যও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই— আর আমরা বলিব

'আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না'? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্ন জল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে— আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব— তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম! এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি, আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।[১২]

আজ যদি কাহাকেও বলি 'সমাজের কাজ করো', তবে 'কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে' তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকই আপনার কর্তব্য উদ্‌ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজে কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহা যদি-বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ— আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না— শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির

হইতে যে উদ্যতশক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়— তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকান বাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়— একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণশাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভালো কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃত উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবে। সমাজের সমস্ত-অভাব-মোচন মঙ্গলকর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশীসমাজের একটি প্রাপ্য -আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠ মন্দির

চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে জলে স্বাস্থ্যে বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনোই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম এক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে— কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।[১৩]

আত্মশক্তি একটি বিশেষস্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষস্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষস্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেণ্ট্ নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হউক, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন – আমরা ভয় করিতেছি ইহাতে বাংলাদেশ দুর্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি এই কান্নাকাটি বৃথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল? দেশকে খণ্ডিত করিলে যে-সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভালো— কিন্তু তবু যদি প্রবেশ

করিয়া বসে তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার, স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না? সেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ় সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে আঘাত করিয়া বাংলাকে নির্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা, ইহারই কর্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ আমাদিগকে উপাধিবিতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সৎকর্মের সাধুবাদ ও আশীর্বাদ আমরা স্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধন্য হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মতো আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তি-স্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইতে হয়।[১৪]

নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন— সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন— ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিতেছে; তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাস স্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনি এই মুহূর্তেই ধীরে ধীরে নূতন কালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা

প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি— জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি।

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্যগণ জয়ী হইলেন— কিন্তু অনার্যেরা আদিম অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না, তাহারা আর্য-উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না, তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্যসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর-একবার সুদীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব আরও গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে, মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই এশিয়াব্যাপী ধর্মপ্লাবনের সময় নানা জাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল। পূর্বাপেক্ষা আরও বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন— নানা-স্বতোবিরোধ-আত্মখণ্ডন-সঙ্কুল এই হিন্দুধর্মের, এই হিন্দুসমাজের ঐক্যটা কোন্‌খানে?

সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। সুবৃহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেমনি কঠিন। কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোটো গোলকের গোলত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যাহারা খণ্ড-খণ্ড করিয়া দেখে, তাহারা ইহাকে চ্যাপ্টা বলিয়াই অনুভব করে। তেমনি হিন্দুসমাজ নানা পরস্পর-অসংগত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যসূত্র নিগূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অঙ্গুলির দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্য-সাধনের প্রক্রিয়া সর্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান -সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যে-সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না, যদি রাখিতেন তো দেখিতেন— এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্যসাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর-এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎসমাজ আছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃস্টান, তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা

বড়ো রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবের সময় সমাজে যে-একটা মিশ্রণ ও বিপর্যস্ততা ঘটিয়াছিল তাহাতে পরবর্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে। নূতনত্ব ও পরিবর্তন মাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা, আঘাতের আশঙ্কা, স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবস্তও রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়— তাহা এক-প্রকার জীবন্মৃত্যু।

বৌদ্ধপরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল তাহাই আটে-ঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য, নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারত-বর্ষকে আপনার একটি মহৎপদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল, ধর্মে বিজ্ঞানে দর্শনে ভারত-বর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না— সেই চিত্ত সকল দিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে, আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্র-

যাত্রা আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি— কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র। আমরা ছিলাম বিশ্বের, দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে সেই শক্তিই কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কার-বদ্ধ স্ত্রৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলংকারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে। তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে তাহা খোওয়াই যাইতেছে।

বস্তুত এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনো-কালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ্‌রূপে ছিল না— তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই— তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার— অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচার-পালন মাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল, যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর-সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না, সমাজকে নব নব তপস্যার ফল— নব নব ঐশ্বর্য -বিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভার গ্রহণ করিল; তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল তাহাকেও অকর্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই— প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্‌ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্‌ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায় তখন হইতেই সেই বিরাট্‌মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় সে কেবল ভারস্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত কেবল টিঁকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত চীন জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বারবাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত চীন জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্‌বেজিত করিয়া ফিরে নাই, সর্বত্র শান্তি সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁট্‌লি-পাঁট্‌লা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেক স্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম বাহির তেমনি হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য! এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল তাহাতে দুইটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কী আশ্চর্য শক্তি ছিল তাহা চোখে

পড়িল এবং আমরা কী আশ্চর্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরাজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল 'গেল গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও আমরা ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি -যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়— আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণ-ভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে— কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশে তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন —ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া

জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না— এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে, ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব তাহা নহে, ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন— তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন।[১৫] ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে। ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট্ একের মধ্যে সকলেরই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্বে— 'একবার তোরা মা বলিয়া

ডাক্!' যে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন— যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন— মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া, দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো। আমরা কি এই জননীর জীর্ণগৃহ সংস্কার করিতে পারিব না? পাছে সাহেবের বাড়ির বিল চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা আসবাব আড়ম্বরে কমতি পড়ে— এই জন্যই আমাদের যে মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন, পরের পাকশালার দ্বারে তাঁহারই অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল— আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর— সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম, কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল, তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে? কখনোই নহে!

নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি— আমাদের দুই-চারি দিনের এই ইস্কুলের মুখস্থবিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি— ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে এবং আমরা নিজের অলক্ষে শনৈঃশনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া— 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!'[১৬]

ভাদ্র ১৩১১

‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট[১৭]

কর্ণ যখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন তখনি তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়াছিল, অর্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই তখনি তিনি সামান্য দস্যুর হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে শক্তি সকলের এক জায়গায় নাই— কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের সর্বাঙ্গে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়।

য়ুরোপের যেখানে বল আমাদের সেখানে বল নহে। য়ুরোপ আত্মরক্ষার জন্য যেখানে উদ্যম প্রয়োগ করে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সেখানে উদ্যমপ্রয়োগ বৃথা। য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট, অর্থাৎ সরকার। সেই স্টেট দেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে; স্টেটই ভিক্ষাদান করে, স্টেটই বিদ্যাদান করে, ধর্মরক্ষার ভারও স্টেটের উপর। অতএব এই স্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সবল কর্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।

আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে; তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা দুর্বিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন

ইহা আমরা অচেতনভাবে মূঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরাজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে—সমাজটাকে নিতান্ত উপরিপাওনার মতো লইতেছে, 'ফাউ' বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখো। ইংরাজের আইন আমাদের সমাজ-রক্ষার ভার লইয়াছে। হয়তো যথার্থভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই বুঝিয়া খুশি থাকিলে চলিবে না। পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা-অনুসারে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। তাহার ফল হইত এই—সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় যাহারা করিত তাহারা স্বতন্ত্রসম্প্রদায়-রূপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন না হিন্দুসমাজে আচার-বিচারের কোনো পার্থক্য নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবস্থার গুণে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই। কোনো অংশে কোনো দল পৃথক হইতে গেলেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন হইতে হয়। পূর্বে এরূপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তখন সমাজ এরূপ সবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া টিকিয়া থাকা সহজ ছিল না। সুতরাং যে দল কোনো পার্থক্য অবলম্বন করিত সে উদ্ধত-ভাবে বাহির হইয়া যাইত না। সমাজও নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল বলিয়াই অবশেষে ঔদার্য প্রকাশ করিয়া পৃথক্‌পন্থাবলম্বীকে যথাযোগ্য-ভাবে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

এখন যে দল একটু পৃথক হয় তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরাজের আইন কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু তাহা স্থির করিবার

ভার লইয়াছে— রফা করিবার ভার ইংরাজের হাতে নাই, সমাজের হাতেও নাই। তাহার কারণ, পৃথক হওয়ার দরুন কাহারও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই— ইংরাজ-রচিত স্বতন্ত্র আইনের আশ্রয়ে কাহারও কিছুতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব এখন হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র ত্যাগ করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।

আক্কেলদাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে তখন বেদনায় অস্থির করে। কিন্তু যখন সে উঠিয়া পড়ে তখন শরীর তাহাকে সুস্থভাবে রক্ষা করে। যদি দাঁত উঠিবার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া দাঁতগুলাকে বিসর্জন দেওয়াই শরীর সাব্যস্ত করে তবে বুঝিব তাহার অবস্থা ভালো নহে, বুঝিব তাহার শক্তিহীনতা ঘটিয়াছে।

সেইরূপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নূতন অভ্যুদয়কে স্বকীয় করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জন করিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য হওয়া, সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে। বরং এই বর্জন করিবার জন্য ইংরাজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যার উপায়।

যেখানেই সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে সেখানে যে কেবল নিজেকে ছোটো করিতেছে তাহা নহে, ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তরথীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িবে। কেবলই খোওয়াইতে থাকিব এই যদি আমাদের অবস্থা হয়, তবে নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্বে আমাদের এ দশা ছিল না। আমরা খোওয়াই নাই, আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমস্ত রক্ষা করিয়াছি, ইহাই আমাদের

বিশেষত্ব— ইহাই আমাদের বল।

শুধু এই নয়, কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া আমরা ইংরাজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারও অগোচর নাই। যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিস্‌ম্যান ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবাররক্ষার চেষ্টা কেন? সেদিন বনবাসই শ্রেয়।

মুসলমান-সমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং খৃস্টান-সমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মতো ধাক্কা দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ সমস্যাটা ছিল না। যদি থাকিত, তবে তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত এই-সকল পরসমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন— এমন ভাবে করিতেন যাহাতে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথায় কথায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে, এই দ্বন্দ্ব— অশান্তি অব্যবস্থা ও দুর্বলতার কারণ।

যেখানে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব বাধিতেছে না, সেখানে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিত-ভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পরের সঙ্গে আপনার সীমানা-নির্ণয় সম্বন্ধে কোনো কর্তৃত্ব প্রকাশ করিতেছে না, নিজের ক্ষয়-নিবারণের প্রতিও তাহার কর্তৃত্ব জাগ্রত নাই। যাহা আপনি হইতেছে তাহাই হইতেছে; যখন ব্যাপারটা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পরিস্ফুট হইতেছে তখন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিলাপে কেহ বন্যাকে ঠেকাইতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাও বিলাপ নহে।

বিদেশী শিক্ষা— বিদেশী সভ্যতা আমাদের মনকে, আমাদের বুদ্ধিকে, যদি অভিভূত করিয়া না ফেলিত, তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা

এত সহজে লুপ্ত হইতে বসিত না।

গুরুতর রোগে যখন রোগীর মস্তিষ্ক বিকল হয় তখনি ডাক্তার ভয় পায়। তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ -প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা তাহা মস্তিষ্কই করিয়া থাকে, সে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে তখন বৈদ্যের ঔষধ তাহার সর্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবল ও বিচিত্রশক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মস্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কী করিয়া?

এইরূপে বিদেশী শিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিতলোক হৃদয় মনকে অভিভূত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা প্রহসনে পরিহাস করে। কিন্তু শান্তভাবে কেহ বিচার করে না যে, কেন এমনটা ঘটিতেছে।

ডাক্তাররা বলেন, শরীর যখন সবল ও সক্রিয় থাকে তখন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় সর্দিকাশি ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায়।

বিলাতিসভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জনা প্রার্থনা করি। স্বস্থানে সকল জিনিসই ভালো, অস্থানে পতিত ভালো জিনিসও জঞ্জাল। চোখের কাজল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে। আমার উপমার ইহাই কৈফিয়ত।

যাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ সক্রিয় থাকিত, তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজ যখন তাহার কলবল— তাহার বিজ্ঞান দর্শন

লইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। যে তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল সেই তপস্যা তখন ক্ষান্ত ছিল। আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পুঁথি রৌদ্রে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা কিছুই করিতেছিলাম না। আমাদের গৌরবের দিন বহুদূর পশ্চাতে দিগন্ত-রেখায় ছায়ার মতো দেখা যাইতেছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীর পাড়িও সেই পর্বতমালার চেয়ে বৃহৎরূপে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়।

যাহাই হউক, আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় সেই সময়ে একটা সচেষ্টশক্তি, শুষ্ক জ্যৈষ্ঠের সম্মুখে আষাঢ়ের মেঘাগমের ন্যায় তাহার বজ্রবিদ্যুৎ বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া, অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্ত বেষ্টন করিয়া দেখা দিল। ইহাতে অভিভূত করিবে না কেন!

আমাদের বাঁচিবার উপায়— আমাদের নিজের শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা। আমরা যে আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া বসিয়া ফুঁকিতেছি ইহাই আমাদের গৌরব নহে, আমরা সেই ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছি ইহাই যখন সমাজের সর্বত্র আমরা উপলব্ধি করিব তখনি নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়া আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে।

আমরা বলিয়া থাকি, 'সমাজ তো আছেই, সে তো আমাদের পূর্বপুরুষ গড়িয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই।'

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। এইখানেই বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা বর্তমান হিন্দুসভ্যতাকে জিতিয়াছে।

য়ুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা। অতীতের সহিত নেশনের বর্তমানের যে কেবল জড়সম্বন্ধ তাহা নহে, পূর্বপুরুষ প্রাণপাত করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্তমান পুরুষ চোখ বুজিয়া ফলভোগ করিতেছে তাহা নহে। অতীত-বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে—

অখণ্ড কর্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। এক অংশ প্রবাহিত আর-এক অংশ বদ্ধ, এক অংশ প্রজ্বলিত অপরাংশ নির্বাপিত —এরূপ নহে। সে হইলে তো সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইয়া গেল— জীবনের সহিত মৃত্যুর কী সম্পর্ক!

কেবলমাত্র অলসভক্তিতে যোগসাধন করে না, বরং তাহাতে দূরে লইয়া যায়। ইংরাজ যাহা পরে, যাহা খায়, যাহা বলে, যাহা করে, সবই ভালো, এই ভক্তিতে আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে— তাহাতে আসল ইংরাজত্ব হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়। কারণ, ইংরাজ এরূপ নিরুদ্যম অনুকরণকারী নহে। ইংরাজ স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার জোরেই বড়ো হইয়াছে, পরের-গড়া জিনিস অলসভাবে ভোগ করিয়া তাহারা ইংরাজ হইয়া উঠে নাই। সুতরাং ইংরাজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরাজত্ব আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইবে।

তেমনি আমাদের পিতামহেরা যে বড়ো হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপরে নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেইজন্যই তাঁহারা বড়ো হইতে পারিয়াছেন। আমাদের চিত্ত যদি তাঁহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়, কেবল তাঁহাদের কৃতকর্মের সহিত আমাদের জড়সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের আর ঐক্য নাই। পিতামাতার সহিত পুত্রের জীবনের যোগ আছে— তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রকমে কাজ করে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের মনে যদি তাহার কোনো নিদর্শন না পাই, আমরা যদি কেবল তাঁহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষ

আর সজীব নাই। শণের-দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য। আমরা একটা বড়ো রকমের যাত্রার দল— গ্রাম্য ভাষায় এবং কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।

পূর্বপুরুষদের সেই চিত্তকে আমাদের জড়-সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে, তবেই আমরা বড়ো হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎস্মৃতি ও বৃহৎভাবের দ্বারা আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া উঠে, নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে সবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়ো।

জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার। আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে পরিবর্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে— কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

সজীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে, আর নির্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা-কিছু পরিবর্তন হইতেছে তাহাতে চেতনার কার্য নাই, তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য-চেষ্টা নাই— বাহির হইতে পরিবর্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।

নূতন অবস্থা, নূতন শিক্ষা, নূতন জাতির সহিত সংঘর্ষ —ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমনভাবে চলিতে ইচ্ছা করি যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিন সহস্র বৎসর পূর্বে বসিয়া আছি, তবে

সেই তিন সহস্র বৎসর পূর্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং বর্তমান পরিবর্তনের বন্যা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা বর্তমানকে স্বীকারমাত্র না করিয়া পূর্বপুরুষের দোহাই মানিলেও পূর্বপুরুষ সাড়া দিবেন না। ৭

আমাদের এই নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন ঘটিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। তাহার কারণ ভীরুতা। আমাদের যাহা-কিছু ছিল তাহারই মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশী সভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

কিন্তু প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম সুপ্তিভঙ্গে যে প্রখর আলোক চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয় তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগভাবে সজ্ঞানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎভাবে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি।

এখন এই আদর্শকে কী করিয়া বাঁচানো যাইবে, সেই ব্যাকুলতা নানাপন্থানুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। যেমন আছি ঠিক তেমনি বসিয়া থাকিলেই যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমাদের এমন দুর্গতি ঘটিত না।

আমি যে ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মতলব মনে মনে আঁটিয়াছি, বঙ্গবাসীর কোনো কোনো লেখক এরূপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন। আমার বুদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা, আশা করি, অন্য দশজনের ততদূর না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণহস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে? প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিব! যদি এমন

মতলবই আমার থাকিবে, তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা কেন? কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে মনে ভূমিকম্পসৃষ্টির মতলব আছে শঙ্কা করিয়া, কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে?

ব্যবস্থাবুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষ বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করে, এ কথার অর্থ ইহা হইতেই পারে না— ভারতবর্ষ স্টীম্‌রোলার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল করিয়া দেয়। বিলাত্‌ পরকে বিনাশ করাই, পরকে দূর করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে; ভারতবর্ষ পরকে আপন করাই আত্মসার্থকতা বলিয়া জানে। এই বিচিত্রকে এক করা, পরকে আপন করা যে, একাকার করা নহে, পরন্তু পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া— এ কথা কি আমাদের দেশেও চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে? আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি— আমরাও যদি পদশব্দটি শুনিলেই, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই, অমনি হাঁহাঃ শব্দে লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে বুঝিব পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই লক্ষ্মীছাড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ নিয়ত কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে— ইহার রক্ষাদেবতা, যিনি সহাস্য-মুখে সকলকে ডাকিয়া আনিয়া সকলকে প্রসাদের ভাগ দিয়া অতি নিঃশব্দে অতি নিরুপদ্রবে ইহাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন, তিনি কখন ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইবেন তাহারই অবসর খুঁজিতেছেন।

প্রশ্ন[১৮] উঠিয়াছে— আমি যেখানে নূতন নূতন যাত্রা কথকতা প্রভৃতি -রচনার প্রস্তাব করিয়াছি সে স্থলে 'নূতন' কথাটার তাৎপর্য কী? পুরাতনই যথেষ্ট নহে কেন?

রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি সত্যপালন সৌভ্রাত্র দাম্পত্য-

প্রেম ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন, কিন্তু তবু নূতন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।

আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরও একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুরু ভাই ভৃত্যের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব— সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে— ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে ?

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে— সমুদ্রযাত্রার আমি সমর্থন করি কি না। যদি করি, তবে হিন্দুধর্মানুগত আচার-পালনের বিধি রাখিতে হইবে কি না।

এ সম্বন্ধে কথা এই— পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথাকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া আমি অনাবশ্যক জ্ঞান করি। কারণ, আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আমার মতেই সমাজগঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্বগ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোনো উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন্ কিরূপ হইবে, আমি তাহা গণনা

করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রসঙ্গক্রমে আমি দু-চারিটা কথা যাহা বলিয়াছি, অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তাহার বিচার করিতে বসা মিথ্যা। আমি যদি সুপ্ত জহরীকে ডাকিয়া বলি— 'ভাই, তোমার হীরামুক্তার দোকান সামলাও', তখন কি সে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণ-রচনার গঠনসম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে, অতএব আমার কথা কর্ণপাতের যোগ্য নহে? তোমার কঙ্কণ তুমি যেমন খুশি গড়িয়ো, তাহা লইয়া তোমাতে আমাতে হয়তো চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোখ জল দিয়া[১১] ধুইয়া ফেলো, তোমার মণিমানিকের পসরা সাম্‌লাও, দস্যুর সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যখন অসাড় অচেতন হইয়া দ্বার জুড়িয়া পড়িয়া আছ, তখন তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।

আশ্বিন ১৩২১

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ-পাঠ

প্রথম সভা

গত ৭ই শ্রাবণ শুক্রবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টার সময় চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে মিনার্ভা-থিয়েটার গৃহে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'স্বদেশী সমাজ'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি সভাগৃহে স্থান না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

... বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে বলিয়া উপসংহারে প্রবন্ধ-লেখক স্বদেশের পূজার জন্য সকলকে যে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় উদ্‌বোধন করিয়াছিলেন তাহা সমবেত শত শত ব্যক্তি চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরবে শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি মুগ্ধভাবে বলিয়াছিলেন— এরূপ প্রবন্ধ তিনি কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ নাই। উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তি এই মন্তব্যের সত্যতা স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের মধ্যে প্রবলভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য

প্রবন্ধপাঠান্তে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া উহার বিশেষ প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রবন্ধের বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগ সর্ববাদিসম্মত, যথা— রাজদ্বারে আবেদন করার অপেক্ষা আত্মনির্ভরের প্রতি লক্ষ স্থির করা উচিত, বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিব দেশে সঞ্চয় করিব ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগ— এমন কতক-

গুলি বিষয় আছে যাহা আমি ভালো করিয়া চিন্তা করি নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমি সুস্পষ্টভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে পারি না। সমাজ-পতি-নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় এই শ্রেণীর। তৃতীয় ভাগ— প্রবন্ধকার মেলার কথা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, জাতীয় উন্নতি -সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু তাহা খুব সুস্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কোনো ব্যক্তি একটি দেশ গজকাঠি লইয়া মাপিতে যান। প্রত্যেকটি স্থান, তাহার ভৌগোলিক সংস্থান, ইতিহাস প্রভৃতি তাঁহার নক্সায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র তত্ত্বের দিকে না যাইয়া হয়তো একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিসংকেতে দূর হইতে দেখাইয়া দেন, সেই আভাসে সমগ্র দেশটির একটি সংক্ষিপ্ত ও জীবন্ত চিত্র দর্শকের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইনি কবি। বৈজ্ঞানিক যেরূপভাবে আমাদের অভাব-অভিযোগের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা বলিয়া উপায়গুলির ক্ষুদ্রতম বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেন রবীন্দ্রনাথ তাহা না করিয়া তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার সংকেতে যেন একটি চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন।

আমরা বিদেশমুখী ছিলাম, এখন স্বদেশমুখী হইব; কেন্দ্রের দিকে লক্ষ রাখিয়া স্বদেশ বিদেশ দুইই আমরা পাইব। অন্ধ কেন্দ্রাভিমুখী গতি আমাদের কল্যাণকর নহে। ধূমকেতুর ন্যায় কেন্দ্রবিচ্যুত হওয়া ভালো নহে। সৌরজগতের গ্রহাদির মতো কেন্দ্রের অধীন হইয়া আমাদের গতি রাখিতে হইবে।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উঠিয়া প্রবন্ধের অশেষ প্রশংসা -পূর্বক বলিলেন, গত ৪০।৫০ বৎসর যাবৎ লোকের মনে যে-সকল

কথা আভাসে উদয় হইয়াছে রবীন্দ্রবাবু তাহাই অপূর্ব ভাষার পরিচ্ছদ পরাইয়া বাহিরে আনিয়াছেন। ভিক্ষাবৃত্তি এখন নিরর্থক হইয়াছে, কিন্তু এক সময়ে উহা সার্থক ছিল। যে যুগে বেন্টিঙ্ক মেটকাফ মেকলে প্রভৃতির ন্যায় উদারহৃদয় ব্যক্তিগণ সত্য-সত্যই এ দেশকে উন্নত করিতে সরলভাবে অভিলাষী ছিলেন, সে যুগে ভিক্ষার ঝুলি শূন্য থাকিত না। তাঁহাদের কার্যকলাপে আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইয়াছিল। সুতরাং দেশের পূর্বনায়কগণ কতকগুলি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়াছিলেন। তখন গৃহস্বামী সদয় ছিলেন। কিন্তু এখন যদি তিনি সিংহদ্বারে অর্ধচন্দ্র লইয়া রোষকষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন, তবে ভিক্ষুকের আশা একেবারে ত্যাগ করাই ভালো। তাঁহারা যদি মনে করিতেন তবে আমাদের অনেক উন্নতি করিতে পারিতেন। জাপান ৩০ বৎসরে যে উন্নতির শিখরদেশে দাঁড়াইল, ১৫০ বৎসরের চেষ্টায় কি তাহা আমাদের অধিগম্য হইত না? ভগবান ইংরেজের দ্বারা আমাদের যে একটা মহৎ উপকারের সুযোগ দিয়াছিলেন তাহা কী কারণে পণ্ড হইল? আমার বিবেচনায় এজন্য ইহারাই দায়ী। ইহারা ইচ্ছা করিয়াছিলেন এজন্য স্কট্‌ল্যাণ্ডের অবস্থা দ্রুতবেগে উন্নতিলাভ করিয়াছে, কিন্তু আয়র্লণ্ড্ ইহাদের অবজ্ঞায় পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আমরা দুরদৃষ্টক্রমে ইহাদের ওয়ার্ল্ড্ এম্পায়ারের মধ্যে স্থান পাই নাই; অস্ট্রেলিয়া যাহা পাইয়াছে, শত্রুতা করিয়াও বোয়ারগণ যাহা পাইল, ভারতবাসিগণ হৃদয়ের রক্ত অজস্র ঢালিয়াও তাহা পাইল না। সুতরাং আমাদের এখন আত্মনির্ভর ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এখন ভারতবাসী সমস্ত জাতি একত্র হইয়া কার্য করিবার দিন; খণ্ড খণ্ড ভারত লইয়া এখন এক মহাভারত গঠন করার সময় হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ বক্তব্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, আমি প্রবন্ধপাঠের উপলক্ষে আপনাদের অনেকটা সময় নিয়াছি, এখন আর-একটু সময় নেব। আমি বাল্যকাল হইতে কাব্যসাহিত্য-দ্বারা আপনাদের হৃদয়-রঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু অদ্যকার উদ্দেশ্য শুধু হৃদয়রঞ্জন নহে। যে লোকের ব্যবসা বাঁশি বাজানো, সহসা সর্পাঘাতের উপক্রম হইলে সে বাঁশিকে লাঠির মতো ব্যবহার করিয়া থাকে। আমার যাহা-কিছু শক্তি আছে তাহা উদ্যত করিয়া আজ দেশের এই দুর্দিনে আসন্ন অমঙ্গলকে ঠেকাইতে চেষ্টা করিতেছি। আমি সমাজের একজন অধি-নায়ক স্থির করার কথা বলিয়াছি। এ দেশে যতপ্রকার চেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে দেখিতে পাই যে, কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্রবর্তী করিয়া আমরা যেরূপ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছি অন্য কোনোরূপে তাহা হয় নাই। একজন লোককে এইভাবে দাঁড় করাইতে পারি নাই বলিয়া আমাদের উদ্যম সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

অতঃপর রবীন্দ্রবাবু স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে সমাজের অধিনায়কের পদে বরিত করিবার পক্ষে অনেকগুলি সুযুক্তি প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের মন্তব্য

সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ নাই।

একটি কথা এই যে, কেবল রাজনীতি বা কেবল সামাজিক বিষয় লইয়া কোনো জাতি উন্নত হয় না। উন্নতি সমস্ত দিক হইতেই হইয়া থাকে। কোনো গাছটি বৃদ্ধি পাইবার পূর্বে যদি নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হয়, উহা

এতদিন শুধু লম্বা হইতে থাকিবে কিংবা এতদিন শুধু চওড়া হইতে থাকিবে, তাহা যেরূপ অস্বাভাবিক— একসঙ্গে লম্বা ও চওড়া হইয়া বৃদ্ধি পাওয়াই নিয়ম— সেইরূপ জাতীয় উন্নতি চতুর্দিক হইতে হইয়া থাকে, শুধু সমাজনীতি বা রাজনীতি লইয়া থাকা একদেশদর্শিতা। ভাগীরথী যেরূপ রাজমহাল হইতে শতধারায় সমুদ্রাভিমুখী গতি লইয়াছে, আমাদের চেষ্টাও সেইরূপ শতমুখী হইয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হইবে। ঐক্য অবলম্বন করিয়া যে-কোনো বিষয়ে কাজ করা যায় তাহাতেই সার্থকতা হইবে। এই সুফল আমাদের রাজার হাতে ততটা নহে যতটা আমাদের হাতে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় সভা

ইহার পর শত শত বিমুখ ব্যক্তি রবীন্দ্রবাবুর দ্বারে ঘুরিতে লাগিল। এই প্রবন্ধ বহু লোকে শুনিতে পান নাই। তাঁহারা সভায় স্থানাভাব-বশতঃ লাঞ্ছনার একশেষ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অসুস্থতা-সত্ত্বেও রবীন্দ্রবাবু পরিবর্ধিত আকারে পুনরায় উহা পাঠ করিতে সম্মত হন। গত ১৬ই শ্রাবণ রবিবার বেলা পাঁচটার সময় কর্জন-থিয়েটার-গৃহে এইজন্য একটি সভা আহূত হয়। এবার টিকিট বিতরণ করিয়া শ্রোতাগণের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ১২০০ টিকিট ৪ ঘণ্টার মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছিল। বহুসংখ্যক লোককে এবারও ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রবাবু জ্বর লইয়া সভাস্থলে আসিয়াছিলেন। তিনি দাঁড়াইতে না

পারিয়া বসিয়া ধীর সুকণ্ঠে তাঁহার সুন্দর প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করেন। যাঁহারা প্রথমবার শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সুকণ্ঠ-উচ্চারিত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় এদিনও যখন তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেন তখন শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার মুখের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রবন্ধকার যখন বলিতে লাগিলেন কলাপাতে খাওয়া আমাদের লজ্জার কথা নহে, একা খাওয়াই লজ্জার কথা— সাহেব-মনস্তুষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া যখন চণ্ডীদাসের পদ উদ্‌ধৃত করিলেন—

'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর'

তখন শত শত শ্রোতা জাতীয়তার যে আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা সভাগৃহকে মৌন স্বদেশভক্তির উচ্ছ্বাসে অপূর্বভাবে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমাজপতি নির্বাচনের প্রস্তাব

পূর্বে উক্ত হইয়াছে এবার প্রবন্ধটি পরিবর্ধিত হইয়াছিল। এবার সমাজের অধিনায়কের পদে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বরণ করিবার প্রস্তাব প্রবন্ধের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল। সে অংশটি এই— 'যিনি এক দিকে আচার ও নিষ্ঠা -দ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপর দিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী ; এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য যাঁহার অপরিচিত নহে, অন্য দিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ ; যাঁহাকে দেশের লোকে যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে ; যিনি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের

স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই ; নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত, নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধসমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ; যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতিসাধারণের সম্মাননীয় কর্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্যবান্ অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন— সেই স্বদেশ-বিদেশের-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধনসম্পদের মধ্যে অবিচলিত তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি।'

সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য

প্রবন্ধপাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি দ্বিতীয় বার শুনিলাম, কিন্তু এরূপ প্রবন্ধ শত শতবার শুনিলেও ইহার রসাস্বাদের জন্য পুনশ্চ আগ্রহ জন্মে। কেহ কেহ বলেন, রবীন্দ্রবাবু জাতীয় নৈরাশ্যের সংগীত শুনাইয়াছেন। আমার মনে হয়— ইহার কথা নব আশার সংগীত। তিনি বলিতেছেন, যে প্রণালীতে আন্দোলন হইয়া আসিতেছে তাহাতে কাজ হইবে না। যাঁহারা গতানুগতিতে কাজ করিতেছেন তাঁহারা হয়তো একটু ভীত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের কার্যে ততটা স্বার্থত্যাগ নাই এবং দেশের জন্য জীবন ব্যয় করিয়া খাটিবার চেষ্টাও নাই। অথচ 'দেশের কার্য করিতেছি' এই বিশ্বাস-জনিত একটা পরিতৃপ্তি আছে। রবীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন— পূর্বে যে প্রণালীতে কাজ করা হইত এখন তাহা উপযোগী নহে। বৎসরের মধ্যে তিন দিন মাত্র একত্র হইয়া বাক্যব্যয় করিলে দেশের বিশেষ কোনো কল্যাণ সাধিত হইবে না। ইংরেজদের সদ্‌ব্যবহারে ইতিপূর্বে খানিকটা আশা ছিল, কিন্তু এখন সে

আশা ঘুচিয়া গিয়াছে, শুভ্রাঙ্গের সাম্রাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গের অধিকারলাভের আশা দুরাশা। যেদিন দেখা গেল স্যালিশ্‌ব্যারি দাদাভাই নৌরজিকে কৃষ্ণাঙ্গ বলিয়া প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞার স্বরে কথা কহিলেন, যেদিন দেখা গেল বোয়ারদের প্রতি শত্রুতা ঘোষণা করিয়াও তাঁহাদিগকে রিপাব্লিক দেওয়া হইল, ভারতবর্ষের শত শত আবেদন উপেক্ষা করিয়া ক্রমেই তাহাদের রাজকীয় অনুগ্রহের গণ্ডী সংকুচিত করা হইতেছে— তখন রাজদ্বারে কাঙালের বেশে উপস্থিত হওয়া যে নিতান্ত নিরর্থক তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তিন দিনের ঝঙ্কারে এখন আমাদের চেষ্টার কোনো সার্থকতা হইবে না। সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়া দেশের কাজ করিতে হইবে। তাহা না হইলে জীবন প্রভাত হইবে না। রবীন্দ্রবাবু আশান্বিতভাবে বলিয়াছেন আমাদের অপমৃত্যু ঘটিবে না। তিনি জাতীয় জীবনের ভূতচিত্র হইতে এ দেশের সামঞ্জস্যবিধানের প্রতিভা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন— এক সময়ে অনার্যকে, তৎপর শক প্রভৃতি জাতিকে, হিন্দুজাতি আত্মীয় করিয়া লইয়াছেন। বৌদ্ধবিপ্লবের পরে হিন্দুজাতির একটু সংকীর্ণতা-অবলম্বন আবশ্যকীয় হইয়াছিল। পারসিক জাতি সেই বন্যার সময়ে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা না করাতে আত্মঘাতী ও লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুজাতি সংকীর্ণতার প্রাচীর তুলিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। এখন আর সেই সংকীর্ণতা ততটা উপযোগী নহে।

বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্য

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, রবিবাবু যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা নূতন নহে এবং তাহা পুরাতনও নহে। নূতন আদর্শ পুরাতন আদর্শকে বর্জন করে নাই।

গত ২৫ বৎসর যাবৎ দেশে যে সাধনা চলিতেছে রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ তাহারই ফল। এক সময়ে পশ্চিমগগনপ্রান্ত সৌরকরচ্ছটায় দীপ্ত হইয়া আমাদিগকে আমন্ত্রিত করিয়াছিল। এখন যদি আমাদের পক্ষে পশ্চিমে সূর্যাস্ত হইয়া থাকে তবে তাহার অভিমুখী হইয়া থাকা পণ্ডশ্রম মাত্র। এখন নবসূর্য পূর্বদিক হইতে সমুদিত হওয়ার লক্ষণ দেখাইতেছে। আর পশ্চিমের দিকে তাকাইলে চলিবে না। এক সময় আমরা ভাবিয়াছিলাম ইংরেজও মানুষ আমরাও মানুষ। তাঁহাদের যাহা সাধ্যায়ত্ত আমাদেরও তাহাই। সে ভ্রম এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। তখন ফরাসি বিপ্লবের প্রচণ্ড আলোকে ইংরেজ আমাদিগের রাজ্যে অভিনব মৈত্রীর মহাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, আমরা তাহাতেই লুব্ধ হইয়াছিলাম। রেড ইণ্ডিয়ানের মতো আমরা শ্বেতাঙ্গের মোহিনীতে মুগ্ধ হই নাই। ইংরেজ এখন সেই মৈত্রীর প্রতিশ্রুতি ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বুদ্ধ যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে দেশের লোক মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ কখনোই বিস্মৃত হইবে না। জাতীয় উন্নতি এখন আর পরকীয় দান -দ্বারা ঘটিবে না, স্বকীয় সাধনা -দ্বারা অর্জন করিতে হইবে। বিলাতে রাজা প্রজার প্রতিনিধি, এখানে তাহা নহে। দশজন দেশীয় লোক আজ সাহেবের সভা আলো করিয়া বসিবেন, ৩০০ প্রস্তাবের মধ্যে তিনটি প্রস্তাব সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করিবেন, ইহাকেই দেশের বিরাট হিত বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে— মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে যেখানে দেশীয় লোকের পক্ষ হইতে ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিবার প্রস্তাব হইল, সেই স্থানে তিন টাকা মঞ্জুরি পাইয়াই কি আমরা ধন্য হইব— এই অকিঞ্চিৎকর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যাহাতে আমরা নিজের পায়ের উপর নিজেরা দাঁড়াইতে পারি তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য। রবীন্দ্রবাবু জাতীয় জীবনের যে নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহাই আমাদের পক্ষে একান্ত অবলম্বনীয়।

রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ বক্তব্য

সভাভঙ্গের পূর্বে রবীন্দ্রবাবু সভার রীতি ভঙ্গ করিয়া দুইটি কথা বলিবার অনুমতি লইলেন এবং বলিলেন—

আজ সমবেত ব্যক্তিগণকে সাহিত্যরস দেওয়ার জন্য আমি দাঁড়াই নাই। শুধু উদ্দীপনায় কোনো কাজই হয় না; আগুন জ্বালাইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়িও চড়াইতে হইবে। ক্রমাগত অগ্নি জ্বালাইলে ইন্ধন নষ্ট করা হয় মাত্র, হাঁড়ি চড়াইয়া হয়তো অগ্নির বেগ সংযত করিবার জন্য গোটাকতক ইন্ধন সরাইয়া ফেলিতেও হইবে। আমাদিগকে অপ্রমত্তভাবে কাজ করিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ সর্বদাই যেন একটা মত্ততার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি, কিছু পরেই উত্তেজনার অবসানে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ি। আমি শুধু উদ্দীপনার জন্য এই প্রবন্ধ পাঠ করি নাই। আমরা অনেক সময় কল্পনা-দ্বারাই খুব বেশি পরিমাণে চালিত হই, দেশের কাজ করিতে হইলে মনে ভাবি যেন ধুমধামের সহিত মস্ত একটা অট্টালিকা গড়িতে হইবে, একটা চূড়া প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন কোনো-একটা সমারোহব্যাপার— আমাদের চেষ্টা এই ভাবে একটা সুবৃহৎ কল্পনায় পর্যবসিত হইয়া যায়। আমরা যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষুদ্রভাবে দেশের জন্য কাজ করিতে পারি। আমার প্রস্তাব— প্রত্যেকে নিজেদের গৃহে স্বদেশের জন্য যদি প্রত্যহ কিছু উৎসর্গ করিয়া রাখেন তবে ভবিষ্যতে সেই সঞ্চয় কাজে লাগিবে। তাহা ছাড়া উহা আমাদের একটা চেতনা প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ইহা, সভা কি বার্ষিক কোনো সমিতির জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া, আমরা অনায়াসে করিতে পারি। এইরূপে নীরবে, কোনো বিশেষ সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া, সেবার কার্য করিতে ভারতবর্ষের একটা বিশেষত্ব আছে। অন্য দেশে রবিবার দিন মাত্র গির্জায় যাইতে হয় এবং প্রার্থনাদির জন্য পাদ্রির

আবশ্যক হয়, কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে মন্ত্র জপিতে হয়— তাঁহার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। সেই মন্ত্র প্রত্যহ আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্‌বোধিত করিয়া দেয়, আমরা সাপ্তাহিক কোনো উত্তেজনার প্রতীক্ষা করি না। আমাদের স্বদেশভক্তিও যেন সেইরূপ কোনো সভা-সমিতির তাগিদের প্রতীক্ষা না করিয়া নীরবে আপন কার্য সমাপন করে। স্বদেশের কাজ যেন বৃহৎ বাহ্য অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়। তজ্জন্য একটা বড়ো ভাণ্ডার করিয়া একজন খাজাঞ্চি হইলেন, একজন টাকা ভাঙিতে লাগিলেন —এইরূপ ভাবের অনুষ্ঠান কখনোই এ দেশে সার্থক হইবে না। আমাদের অবস্থা একটা গল্পের কথায় এই ভাবে বলা যাইতে পারে— একজন একটা পয়সা খুঁজিতে দীপ জ্বালাইয়া ইতস্তত সন্ধান করিতে করিতে তাহার পূর্বপুরুষের একটা রত্নভাণ্ডারের খোঁজ পায়, তথাপি মাটি খুঁড়িয়া তাহা বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্রমাগত সে যদি সেই একটা পয়সার খোঁজই করিতে থাকে, তবে এমন ব্যক্তিকে কী বলা যাইবে? ইংরেজ সেইরূপ এ দেশে আসিয়া কয়েকটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল। তাহা খুঁজিতে যাইয়া আমরা দেশীয় আত্মশক্তির রত্ন-ভাণ্ডারের খোঁজ পাইয়াছি। তথাপি কেহ কেহ সেই পয়সা কয়েকটির খোঁজ করিয়াই সময় অতিবাহিত করিতেছেন। ইংরেজের ভোজের নিমন্ত্রণে আমাদের আহ্বান নাই, তথাপি দ্বারস্থ হইয়া সেই টেবিলের দিকে চাহিয়া থাকিতেছি। যাহা গড়াইয়া পড়িতেছে তাহার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিপাত না করিয়া, বাড়িতে যাইয়া হাঁড়ি চড়াইয়া ভাত ডালের ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে? সেই শাকান্নও আমাদের পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।*

ভাদ্র ১৩১১

* এই বিবরণী সভাস্থলেই নোট করা হইয়াছিল।... বক্তাগণের কথার সারমর্ম সংকলিত... সাধ্যমত তাঁহাদের নিজের ভাষা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। —শ্রুতিলেখক

স্বদেশী সমাজ

সংবিধান

পাঠক দয়া করিয়া নিজের অভিপ্রায়-মত এই নিয়মাবলী পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিয়া জোড়াসাঁকোয় ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহারা এই কার্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এই সঙ্গে পাঠাইলে বাধিত হইব।

আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েক জনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব।

আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব -মোচন ও কর্তব্য-সাধন আমরা নিজে করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে-সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।

সমাজের অধিনায়ক ও তাঁহার সহায়কারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজনির্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব।

বাঙালী মাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।

সাধারণত ২১ বৎসর বয়সের নীচে কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না।

এ সভার সভ্যগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশ্যক।—

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনো-প্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্মেন্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্য-সেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাঙলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজনির্দিষ্ট বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সমাজের কর্তব্য আবদ্ধ থাকিবে—

সামাজিক ব্যবহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কলাবিদ্যা, ব্যবসাবাণিজ্য, বিচার ও সাহিত্য।

সামাজিক ব্যবহার অর্থাৎ বেশভূষা, গৃহোপকরণ, আহার বিহার, এক কথায় চাল-চলন সম্বন্ধে সমাজ যে আদর্শ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন তাহা সকলকে পালন করিতে হইবে। সমাজের বিশেষ লক্ষ থাকিবে যাহাতে আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শ আড়ম্বরশূন্য ও অল্পব্যয়সাধ্য

হইতে পারে, যাহাতে আমাদের অধীনস্থ আত্মীয় বালকগণ কঠিন সংযমে দীক্ষিত হইয়া পৌরুষ ও চরিত্রবল লাভ করে।

সমাজবর্তিগণের জন্য একটি বালক ও বালিকা -বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। দেশে একটি স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা সমাজের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।

সমাজের অধীনে সাধারণ পাঠাগার ব্যায়ামশালা ক্রীড়াস্থল ব্যাঙ্ক্ ও মিলনগৃহ -স্থাপনের চেষ্টা করা হইবে।

দেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবসাবাণিজ্য কলাবিদ্যা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে-সকল উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য, সমাজ তৎপ্রতি আপনার যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিবেন।

সমাজের একজন অধিনায়ক থাকিবেন।

সমাজে যে-কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, আলোচনান্তে অধিনায়ক তৎসম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় স্থির করিবেন, অবিসম্বাদে তাহাই গ্রাহ্য হইবে।

তাঁহার স্বাক্ষরিত আদেশ সমাজের আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

অধিনায়ক যে-কোনো সামাজিককে কারণ-নির্দেশ -ব্যতিরেকেও সমাজ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন।

অধিনায়কের সহায়তার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। মন্ত্রিগণ অধিনায়কের অনুমতি অনুসারে উপযুক্ত লোককে যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত করিবেন; তাঁহাদের কর্ম পরিদর্শন করিবেন; তাঁহাদের নিকট হইতে কর্মবিবরণী গ্রহণ করিবেন ও তাহা অধিনায়কের নিকটে উপস্থিত করিয়া আলোচনা করিবেন।

মন্ত্রিগণ বয়োজ্যেষ্ঠতা-অনুসারে অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কর্মভার গ্রহণ করিবেন। পরন্তু অধিনায়কের পূর্বকৃত কোনো অভি-

প্রায়ের পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

মন্ত্রিসভার সঙ্গে একটি কর্মিসভা থাকিবে। কর্মিগণ সমন্ত্রিক অধিনায়কের আদেশে বিশেষ বিশেষ কর্মভার গ্রহণ করিবেন।

কর্মিসভার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এক-একজন সভ্য মন্ত্রিসভায় স্থান পাইবেন।

সাধারণ সামাজিকগণ সমাজকে কর দিয়া ইহার বিধান মানিয়া চলিবেন ও তাঁহাদের কাহারও প্রতি কোনো বিশেষ আদেশ বা ভার পড়িলে তাহা পালন করিবেন।

অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে একুশের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছাত্রদের জন্য এই সমাজে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ থাকিবে।

যে-সকল ব্যক্তি বিশেষ কারণে সমাজের সম্পূর্ণ বাধ্যতা স্বীকার করিবেন না অথচ সমাজের প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ থাকিবে, যাঁহারা সমাজকে অর্থদান ও অন্য উপায়ে সাহায্য করিবেন, যাঁহারা সমাজ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোনো বিশেষ কর্মে বিশেষভাবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিবেন, যাঁহারা কেবলমাত্র সমাজের একটি বা দুইটি বিভাগেরই সহিত যোগ রক্ষা করিবেন, তাঁহারা সমাজের বন্ধুমণ্ডলীরূপে গণ্য হইবেন।

যাঁহারা সমাজভুক্ত নহেন, আবশ্যকবোধে বা সম্মানার্থ অধিনায়ক তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

দুই বৎসর অন্তর অধিনায়ক মন্ত্রিসভা ও কর্মিসভার পরিবর্তন হইবে।

তখন সামাজিকগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মানস্বরূপ বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে মন্ত্রিসভা ও কর্মি-সভা নির্বাচিত হইবে এবং সেই মন্ত্রী ও কর্মী -গণ অধিনায়ক নির্বাচন করিবেন।

নির্বাচনের মত-দান পরস্পরের অগোচরে সমাধা হইবে।

নির্বাচনের অধিকার ছাত্র-সামাজিকগণ প্রাপ্ত হইবেন না।

সমাজের মধ্যে পঞ্চবিংশতির অধিক ব্যক্তি এই নির্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

সমাজের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে এই পঞ্চবিংশতিজন নির্বাচনের অধিকার লাভ করিবেন।

যে-কোনো সামাজিককে অধিনায়ক এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন।

পাঁচজনের অধিক মন্ত্রী ও দশের অধিক কর্মী থাকিবে না। মাসে অন্তত একবার ও দুই মাস অন্তর সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

কর্মিসভার বিশেষ বিশেষ সমিতি কর্মানুসারে আবশ্যকমত তাঁহাদের সভা আহ্বান করিবেন।

সামাজিকগণ অথবা অন্য কেহ নিজের বা সমাজের কর্তব্য সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন বা প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে অধিনায়ক মন্ত্রিগণসহ বিচার করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন। আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব -অনুসারে তাঁহারা বিশেষ ব্যক্তিগণ বা সামাজিক সাধারণকে আহ্বান করিতে পারিবেন।

এই-সকল কার্য ব্যতীত সামাজিকগণ পার্বণ-উপলক্ষে উৎসবসভায় মিলিত হইবেন।

সমাজবর্তী প্রত্যেককেই নিজের আয়ের নির্দিষ্ট অংশ করস্বরূপ সমাজকে দিতে হইবে।

ত্রিশ টাকা পর্যন্ত দুই আনা, পঞ্চাশ টাকায় চার আনা, এক শ টাকা হইতে হাজার টাকা পর্যন্ত শতকরা এক টাকা ও তদূর্ধ্বে শতকরা দেড় টাকা কর দিতে হইবে।

ছাত্র-সামাজিকগণকে বৎসরে আট আনা কর দিতে হইবে।

সমাজে প্রবেশকালে প্রত্যেককে প্রবেশিকা এক টাকা দিতে হইবে।

কাহারও আয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনোরূপ আলোচনা বা অনুসন্ধান করা হইবে না।

বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে সামাজিকগণ যে ব্যয় করিবেন তাহার অন্তত শতকরা আট আনা সমাজে দান করিতে হইবে।

প্রত্যেক সামাজিকের বাড়ি একটি করিয়া বাক্স থাকিবে। এই বাক্সে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছাদত্ত খুচরা দান জমা হইবে। মাসের শেষে এই দান সমাজের বাক্সে গৃহীত হইবে। কোন্ বাক্স হইতে কত গৃহীত হইল তাহা যাহাতে অগোচর থাকে, সেইরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে।

কর-আদায় সম্বন্ধে কোনো সামাজিককে কোনো অনুরোধ করা হইবে না। তাঁহাদের নিজের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা হইবে।

কর আদায় না হইলেও তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে অপসারিত করা হইবে না।

যাঁহারা অধিনায়কের আদেশ মানিবেন না, সমাজের বিধান লঙ্ঘন করিবেন, সমাজের মান্য ব্যক্তিগণকে অপমান করিবেন, সামাজিকগণকে বিদ্রোহী করিবার চেষ্টা করিবেন, বিশেষ কর্মে নিযুক্ত হইয়া কর্মক্ষেত্রে বারম্বার অনুপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে তৎসম্বন্ধে অধিনায়ক সতর্ক করিলে পর যদি তাঁহারা সমাজনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তবিধি -অনুসারে দণ্ড স্বীকার-পূর্বক আচরণ সংশোধন না করেন, তবে অধিনায়কের আদেশ-অনুসারে তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে অপসারিত করা হইবে।

সমাজের বিচারে কোনো সামাজিক সমাজবিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করিলে সমাজের বারো আনা লোকের সম্মতিক্রমে সামাজিকগণ তাঁহার

সহিত সর্বপ্রকার ব্যবহার রহিত করিবেন।

প্রথম এক বৎসর সমাজগঠনকাল-রূপে গণ্য হইবে।

এই বৎসরে অধিনায়ক কেহ থাকিবেন না।

একটি প্রতিষ্ঠাসমিতি মন্ত্রিসভা ও কর্মিসভা নির্বাচন করিবেন।

মন্ত্রিগণ বিস্তারিতরূপে নিয়ম রচনা ও সমাজের কার্য চালনা করিতে থাকিবেন।

বয়োজ্যেষ্ঠতা-অনুসারে পর্যায়ক্রমে এক-একজন মন্ত্রী নায়কের পদ গ্রহণ করিবেন ও তৎকালে তাঁহার অভিপ্রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তিনি পূর্বমীমাংসিত কোনো বিষয়ের পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

মন্ত্রিসভার চারিজন একমত হইলে তবে পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

সমাজের বিধিগুলি যেমন যেমন স্থির হইবে, অমনি তাহা সমাজে প্রচলিত হইতে থাকিবে।

এক বৎসরের শেষে এই মন্ত্রী ও কর্মী -সভা অবসর লইবেন ও তখন সমাজের নিয়ম-অনুসারে নূতন নির্বাচন হইবে।*

* মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্র : সংগ্রাহক শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে পরিদৃষ্ট ও পুনর্মুদ্রিত।

পল্লীসমাজ

সংবিধান

প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লীসমাজ স্থাপন করিতে হইবে। শহর গ্রাম কি পল্লী -নিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লীসমাজ -ভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লী -বাসীর অভিপ্রায়মত অন্যূন পাঁচজনের উপর প্রতি পল্লীসমাজের কার্যনির্বাহের ভার থাকিবে। তাঁহারা পল্লীবাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লীসমাজের কার্য করিবেন। পল্লীসমাজের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল। প্রতি পল্লীসমাজ সাধ্যমতে এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইবেন।

উদ্দেশ্য

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব -সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২। সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ-বিসম্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প -উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যকমত নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা-সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের

মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি ধর্মভাব একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬। প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ অনাথ ও অসহায় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ঔষধ পথ্য সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭। পানীয় জল, নদী, নালা, পথ, ঘাট, সৎকারস্থান, ব্যয়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার -স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্ত পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গোমহিষাদির পালন -দ্বারা জীবিকা-উপার্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষনিবারণার্থে ধর্মগোলা-স্থাপন।

১০। গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১১। সুরাপান বা অন্যরূপ মাদকদ্রব্য-ব্যবহার হইতে লোককে নিবৃত্ত করা।

১২। মিলনমন্দির ক্লাব -স্থাপন ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৩। পল্লীর তত্ত্ব-সংগ্রহ : অর্থাৎ, জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসিগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি অবনতি, বিদ্যালয় পাঠশালা ও ছাত্র ও ছাত্রী -সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জর) ওলাউঠা বসন্ত ও অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত

রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব-সংস্থাপন ও ঐক্য-সংবর্ধন।

১৫। জেলা-সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের ও কার্যের সহায়তা করা।

অর্থের ব্যবস্থা

পল্লীসমাজের কার্য স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বরবৃত্তি দ্বারা চলিবে। যাঁহাদের বিবাদ-বিসংবাদ সালিশিতে মেটানো হইবে তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাপূর্বক সমাজের মঙ্গলার্থ কিছু অর্থসাহায্য করিবেন। বিবাহাদি শুভকার্যেও সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক এইরূপ বৃত্তি দিবেন। পল্লীবাসীমাত্রেই সপ্তাহে সপ্তাহে কি মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া সমাজের কার্যনির্বাহের জন্য যথাসাধ্য দান করিবেন। পল্লীসমাজের অন্তর্গত সমস্ত হাট-বাজার হইতেও ঈশ্বরবৃত্তি সংগৃহীত হইতে পারিবে। প্রতি বৎসর গ্রামে গ্রামে বারোয়ারি পূজার নাচ-তামাসায় যে অর্থ বৃথা নষ্ট হয়, ঐ-সমস্ত অপব্যয় সংকোচ করিলে সেই অর্থ-দ্বারা পল্লীসমাজের কার্যের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। পল্লীসমাজ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না।*

* হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'কংগ্রেস' (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ১৬৩-৬৬) হইতে।

জলকষ্ট

শ্রীমতী কনিষ্ঠা

গতবৎসর জলকষ্ট লইয়া আমাদের দেশে একটা আন্দোলন হইয়া গেছে। সুতরাং এ আন্দোলন আর যে শীঘ্র উঠিবে, এমন আশা নাই— কেননা, কথা কহিয়া কাগজে লিখিয়া আমাদের মনটা বেশ খোলসা হইয়া গেছে।

আমাদের ঘরের কাছে জলের কল আছে, অতএব পাড়াগাঁয়ের জলের কষ্ট লইয়া আমরা যেটুকু মাথা বকাইয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের বিশুদ্ধ দেশানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

কেবল দুঃখ এই— এ দেশানুরাগে জলের তৃষ্ণা মেটে না, জ্যৈষ্ঠের পর জ্যৈষ্ঠমাস ফিরিয়া আসে। দেশের তালু শুকাইয়া যায়, মধ্যাহ্নে অতিথি আসিয়া জল চাহিলে এক গণ্ডূষ জল দিতে গৃহীর হাত সরে না, প্রখর রৌদ্রে ভিজা বালি খুঁড়িয়া তুলিয়া সেই বালি মাথায় দিয়া স্নানের কাজ সারিতে হয় এবং একটি ঘড়া জল আনিতে মেয়েরা দেড় ক্রোশ তপ্তপথ হাঁটিয়া যায় এবং ফিরিতে আর দেড়টি ক্রোশ লাগে। ইহা আমার জানা কথা।

এই দেশানুরাগীদের পূর্বপুরুষেরাই গ্রামে গ্রামে পুকুর দিয়াছিলেন, পথের ধারে জলসত্র খুলিয়াছিলেন, জ্যৈষ্ঠমাসে বরফমিশ্রিত লেমনেড খাইবার সময় এই কথাটা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

পুরুষের দেশানুরাগ, বোধ করি, লোকের ক্ষুধা-মিটানো, তৃষ্ণা-মিটানো, রোগের তাপ-নিবারণ করার কথা তেমন করিয়া ভাবিতে পারে না। মন্ত্রিসভার সভ্য হওয়া, মোটা মাহিনার চাকরি পাওয়া, এইগুলাই তাহারা বেশি করিয়া বোঝে।

কিন্তু ক্ষুধিতের অন্ন জুটিতেছে না এবং তৃষিত জল পাইতেছে না ইহাতে আমাদের স্ত্রীলোকের প্রাণ যদি না কাঁদে, তবে দেশের মর্মস্থান পর্যন্ত বিকৃত হইয়া গেছে এ কথা মানিতে হইবে।

স্ত্রীলোকের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা নাই, পুরুষেই কর্তা, এই একটা বলিবার কথা আছে বটে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য কি না সে আলোচনা আপাতত করিতে চাই না। কিন্তু দেশে বিধবা-স্ত্রীলোকের হাতে জমিদারি পড়িয়াছে, দেশে এমন ঘটনা বিরল নহে। কাগজে যখন দেখিতে পাই তাঁহারা সদর স্টেশনে গবর্মেন্টের সদর-আপিস-নির্মাণের জন্য জমি ছাড়িয়া দিতেছেন, তখন আমি বাঙালি স্ত্রীলোক, স্বদেশী মেয়েদের উপর আমার ধিক্কার জন্মে।

আমাদের দেশের পুরুষেরা অনেক দিন হইতে গোলামি করিয়া আসিতেছে— গবর্মেন্টের নাড়া না খাইলে, উপাধির লোভ না পাইলে, তাহাদের যদি সাড়া না পাওয়া যায়, তবে নাহয় তাহাদিগকে মাপ করা যাইবে। কিন্তু আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের একটা গর্ব ছিল যে, দেশের ধর্ম দেশের অন্তঃপুরেই শেষ আশ্রয় লইয়াছে। আমাদের এই গর্ব ছিল যে, যখন দেশের পুরুষেরা অনেক দিন ধরিয়া যে চরণের আঘাত খাইতেছে সেই চরণে লুটাইয়াই জন্ম কাটাইল, তখন মেয়েরা যে চরণকে ভক্তি করে সেই চরণেরই সেবা করিয়া আসিয়াছে। মেয়েরা ভয়ের তাড়না বা লোভের উত্তেজনায় নয়, কিন্তু প্রাণের টানেই ক্ষুধিতের ক্ষুধা, তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মিটাইয়া আসিয়াছে, রোগের সেবা ও শোকের সান্ত্বনা তাহাদের স্নেহেরই কাজ, অতএব ধর্মই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট— রাজদণ্ডের প্রয়োজন নাই।

দেশের কপালক্রমে এখন কি তাহার উল্টা দেখিতে হইবে? দেশে যখন অন্নজলের টানাটানি তখন যে স্ত্রীলোকের হাতে ভগবান সামর্থ্য

দিয়াছেন, সেও তেলামাথায় তেল ঢালিয়া গেজেটে নাম লিখাইতে যাইবে? আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের আবার নাম কিসের? আমাদের স্বামীর নাম হোক, আমাদের ছেলের নাম হোক— নাম আমাদের বাপের আমাদের শ্বশুরের হোক্, ধর্ম আমাদের থাক্!

আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না যে, আমাদের মেয়েদের প্রাণ কঠিন হইয়া গেছে। তাহা হইলে সংসার চলিত না। যে মেয়েরা ঈশ্বরের কৃপায় অন্নদান জলদান করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভালো করিয়া জানেন না কোথায় ক্ষুধা— কোথায় তৃষ্ণা।

আজ কাঠফাটা রৌদ্রের দিনে বাংলাদেশের তৃষ্ণা যে কতখানি, তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের কানে পৌঁছায় না। যাহারা জানে তাহারা বলিবে— এত অসহ্য দুঃখ, মহাপাপ নহিলে দেশে ঘটিতে পারে না। সে পাপের বিচার ভগবান করুন— কিন্তু যে মেয়েমানুষ সে যেন তাহার পোষ্যপুত্রটির উদ্দেশে কেবল কোম্পানির কাগজের সুদ না গোণে; তৃষ্ণাতুর দেশ যখন তাহার প্রাসাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতে থাকে 'মা আমাকে একটু জল দাও', তখন যেন মোটা দেওয়ানবাবু তাড়া করিয়া আসিয়া এই হতভাগ্য অতিথিকে চোখের জলে বিদায় করিয়া না দেয়।

জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের চাঁদার খাতায় যদি বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতে হয়, তবে এমন করিয়া কি করা যায় না যাহাতে দেশের মুখে কলঙ্কপাত না হয়, যাহাতে গেজেটেও নাম ওঠে আর পিপাসার জল পাইয়া পীড়িত ভগবানও প্রসন্ন হন? ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়েও তিনি কি ছোটো?

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

অহেতুক জলকষ্ট

শ্রীমতী মধ্যমা

জলকষ্ট সম্বন্ধে আমাদের ভগিনী শ্রীমতী কনিষ্ঠা দেশের ধনী বিধবাদের নামে যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা সমস্তই মানিয়া লওয়া গেল। দেশে ধনী বিধবা কয়জনই বা আছেন? তাঁহারা সকলেই যদি তৃষার্তকে দয়া করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলেও কতটুকুই বা সুবিধা হইবে?

কিন্তু দয়া হয় না কেন? সেইটেই ভাবিবার কথা।

শ্রীমতী কনিষ্ঠাকে আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। যেখানে জলের অভাব নাই সেখানেও যে দেশের লোক জোর করিয়া অকারণে জলকষ্ট সৃজন করে, তৃষ্ণা কাহাকে বলে সে দেশের লোককে কি ঈশ্বর জানাইবেন না? পাপ না থাকিলে কি মানুষ এত দুঃখ পায়?

যাঁহারা দেশের লোক-তালিকা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন বাংলাদেশে বিধবার সংখ্যা কত? নিশ্চয়ই বড়ো কম নয়। ইহাদের মধ্যে নিতান্ত শিশু বালবিধবাও অনেক আছে। দুটি-একটি বিধবা নাই এমন হিন্দুঘর বোধ হয় বাংলাদেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী কনিষ্ঠা একবার একাদশীর কথাটা ভাবিয়া দেখুন দেখি। দেশের এক সীমা হইতে আর-এক সীমা পর্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে সে কী দুঃখ! রোগী-বিধবা জল না পাইয়া মরিতেছে, শিশু-বিধবা পাছে লুকাইয়া জল খায় বলিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইতেছে এবং আচারবতী বিধবা শুষ্কতালু লইয়া মনে মনে একাদশীর প্রত্যেক দণ্ড গণনা করিতেছে।

বাংলাদেশের ভগবান্ যদি এমন নিষ্ঠুর হন যে, এই-সকল হতভাগিনী

অবলাদের পক্ষে বিনা কারণে অসহ্য জলতৃষ্ণাকেই তিনি পুণ্যের উপায় করিয়া থাকেন, তবে এ দেশের মানুষের মনে দয়া হইবে কেমন করিয়া? বাপ মা যেখানে মেয়েকে, ছেলে মেয়ে যেখানে মাকে, মরিয়া গেলেও মুখে জল দিতেছে না, সেখানে দেশের জলকষ্টের জন্যে দুটো-চারটে ধনী বিধবার মনে দয়া জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া ফল কী হইবে?

অথচ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে যখন জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সকলেই বলেন, এরূপ নিরম্বু উপবাস কোনো প্রামাণ্য শাস্ত্রের বিধান নহে। তবে তাঁহারা এই অশাস্ত্রীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে কথা কহেন না কেন? তাঁহাদের সাহস হয় না। যে দেশের শাস্ত্রজ্ঞানীরা এত বড়ো অধর্ম করিতে পারেন, সে দেশ জলের কষ্ট কাহাকে নিবেদন করিবে?

বিশেষ কোনো তিথিতে মানুষ জল না খাইলে দয়াময় ভগবান তাহার 'পরে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন এ কথা বিশ্বাস করেন না এমন লোক নিশ্চয়ই এ দেশে অনেক আছেন, তবু তাঁহারা যদি তাঁহাদের কন্যা ভগিনী মাতাকে জানিয়া-শুনিয়া নিষ্ফল পীড়া দিতে পারেন, তবে এমন পাপিষ্ঠ দেশকে দয়া করিবে কে?

এমনও শুনিয়াছি— একাদশীর দিনে বিধবার নিরম্বু-উপবাস বাংলা-দেশের বাহিরে কোথাও প্রচলিত নাই। যে প্রথা কোনো শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রে উপদিষ্ট বা অধিকাংশ হিন্দুসমাজেই অনুষ্ঠিত হয় না, সেই প্রথাকে দেশের পণ্ডিত লোকেরা যদি উঠাইয়া দিতে না পারেন— যে-সকল অন্যায় তাঁহাদের স্বকৃত এবং যাহার প্রতিকার তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত তাহাদের সম্বন্ধেও যদি তাঁহারা উদাসীন থাকেন— তবে জলকষ্টের কথা যে আমরা লজ্জায় মুখে আনিতে পারিব না।

আমাদের অনেক দুঃখকষ্টের প্রতিকারের জন্য দেশের শিক্ষিত লোকে গবর্মেণ্টের কাছে দাবি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের মনের উত্তেজনা

ও ভাষার অসংযম দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। দেশের দুঃখে বাস্তবিকই যদি তাঁহারা এত অধিক ব্যথা পান, তবে যে-সকল দুঃখ নিজেরা দূর করিতে পারেন সাহস করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করুন। আর শ্রীমতী কনিষ্ঠার প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহার ঘরের মধ্যে যে অনাবশ্যক অন্যায় জলকষ্ট আছে তাহা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার যতটুকু শক্তি আছে তাহা যদি প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে দেশের জলাভাবের কথা উত্থাপন করিবার অধিকার তাঁহার জন্মিবে এবং কর্তব্যবিমুখ নরনারীকেও সবলে তিরস্কার করিতে পারিবেন।

আষাঢ় ১৩১২
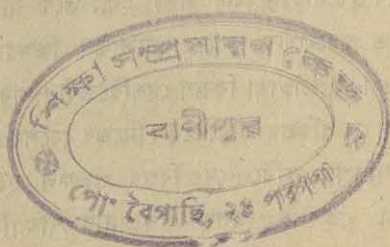
…আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।… ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই—ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়।…

ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। আর, তাহাই যদি না পাই তবে আসল জিনিসটাই পাইলাম না। কারণ, ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী। আমাদের সমস্ত জাতির যদি এই একমাত্র কাজ হয়, ইংরাজদের কাছে আবদার করা, ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করা, তাহা হইলে প্রত্যহ আমাদের জাতির জাতিত্ব নষ্ট হইতে থাকিবে— ক্রমশই আমাদের আত্মত্ব বিসর্জন দিতে হইবে।…

…যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিলে আমাদের দেশে এমন ঢের কাজ আছে যাহা আমরা নিজেই করিতে পারি, এবং যাহা-কিছু আমরা নিজে করিব তাহা সফল না হইলেও তাহার কিছু-না-কিছু শুভফল স্থায়ী হইয়া থাকিবে। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে যাঁহারা কেবলমাত্র অথবা প্রধানত গবর্মেণ্টের কাছে ভালোরূপ ভিক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি করিতে চান, তাঁহারা কিরূপ দেশহিতৈষী! গবর্মেণ্ট্‌কে চেতন করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে-যে বিস্তর শুভফল হইত। দেশের লোককে তাঁহারা কেবলই জ্বলন্ত উদ্দীপনায় শাক্যসিংহ ব্যাস বাল্মীকি ও ভীষ্মার্জুনের দোহাই দিয়া গবর্মেণ্টের কাছে ভিক্ষা চাহিতে বলিতেছেন। তাহার চেয়ে সেই উদ্দীপনাশক্তি ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে উপার্জন করিতে বলুন না কেন। আমরা কি নিজের সমস্ত কর্তব্য কাজ সারিয়া

বসিয়া আছি যে, এখন কেবল গবর্মেণ্ট্‌কে তাহার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেই হইল! সত্য বটে পরাধীন জাতি নিজের সমস্ত হিত নিজে সাধন করিতে পারে না, কিন্তু যতখানি পারে ততখানি সাধন করাই তাহার প্রথম কর্তব্য, গবর্মেণ্টের কাছে ভিক্ষা চাওয়া বা গবর্মেণ্ট্‌কে পরামর্শ দিতে যাওয়া পরে হইতে পারে বা তাহার আনুষঙ্গিক-স্বরূপে হইতে পারে।

…কেবল মাত্র পরকে কাজ করিতে অনুরোধ করিবার জন্য তোমরা যে টাকাটা সঞ্চয় করিতেছ সেই টাকায় নিজে কাজ করিলেই ভালো হয়, এই আমার কথার মর্ম।…

যাঁহারা যথার্থ দেশহিতৈষী তাঁহারা দেশের অল্প উপকারকে নিজের অযোগ্য বলিয়া ঘৃণা করেন না। তাঁহারা ইহা নিশ্চয় জানেন যে যদি হাঙ্গাম করা উদ্দেশ্য না হয়, দেশের উপকার করাই বাস্তবিক উদ্দেশ্য হয়, তবে অল্পে অল্পে একটু একটু করিয়া কাজ করিতে হয়। তাহাতে এক রাতের মধ্যে যশস্বী হওয়া যায় না বটে, মোটা মোটা কথা বলিবার সুবিধা হয় না বটে, কিন্তু দেশের উপকার হয়। তাঁহারা ইহা জানেন যে, মস্ত মস্ত উদ্দেশ্য জাহির করিলে দেশের যত না কাজ হয়, ছোটো ছোটো কাজ করিলে তাহার চেয়ে বেশি হয়।…

কার্তিক ১২৯০

২

প্রেমের ধর্ম এই, সে ছোটোকেও বড়ো করিয়া লয়।…

আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশপ্রেম যাহার বেশি সেই প্রাণ ধরিয়া স্বদেশের ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অভাবের প্রতি মন দিতে পারে; সে কিছুই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে না।…

...যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া ‘অ্যাজিটেট’ করিয়া বেড়াইলে হইবে না। হাতে-কলমে এক-একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে।... আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারি দিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম-নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে? তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে।... তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব, স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি— আমাদের সম্ভ্রমই বা কী— আস্ফালনই বা কী! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা অ্যাজিটেট করিতে যাইব?

তবে অ্যাজিটেট করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে!...

...ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাতজোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতর তামাসা? সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না? অসম্মান দূর করিব না?...

...যথার্থ স্থায়ী ও ব্যাপক উন্নতি কি আমাদের নিজের ভাষা, নিজের সাহিত্য, নিজের গৃহের মধ্য হইতে হইবে না!...

...এখনই যথার্থ পৃথিবীর ভূ-পবলিক তৈরি হইয়াছে। আগে যেখানে ছিল মহাশিখর, এখন সেখানে হইয়াছে মহাদেশ। আমাদের এই তরুণ সমাজে আমাদের এই ভাবিতে হইবে— কবে আমাদের সেই

সামাজিক মহাদেশ সৃজিত হইবে! সেই মহাদেশ সৃজন করিবার উদ্দেশে আমাদের সকলকেই আপনাকে সৃজন করিতে হইবে, আপনার আশ-পাশ সৃজন করিতে হইবে। আপনাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেকে উঠিব, প্রত্যেকে উঠাইব —এই আমাদের এখনকার কাজ। কিন্তু সে নাকি কঠোর সাধনা, সে নাকি নিভৃতে সাধ্য, সে নাকি প্রকাশ্য স্থলে হাঙ্গাম করিবার বিষয় নহে, সে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সমষ্টি— সে কঠিন কর্তব্য বটে, অথচ ছায়াময়ী বৃহদাকৃতি দুরাশা নহে— এই নিমিত্ত উদ্দীপ্তহৃদয়দের তাহাতে রুচি হয় না। এরূপ অবস্থায় এইসকল ছোটো কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ডমূর্তি কাজের ভাণ ফাঁকি মাত্র। আমাদের চারি দিকে, আমাদের আশে-পাশে, আমাদের গৃহের মধ্যে, আমাদের কার্যক্ষেত্র।…

সেই গৃহপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশে সেই স্বদেশপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশীয়ের প্রতি স্বদেশীয়ের বাহুপ্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ব্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।…

আশ্বিন ১২৯১

৩

ন্যাশনাল শব্দটা যখন বাংলাদেশে প্রথম প্রচার হয় তখনকার কথা মনে পড়ে। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া হঠাৎ দেখা গেল চারি দিকে ন্যাশনাল পেপার, ন্যাশনাল মেলা, ন্যাশনাল সং (song), ন্যাশনাল থিয়েটার— ন্যাশনাল কুজ্ঝটিকায় দশ দিক আচ্ছন্ন।… এই ন্যাশনাল উদ্দীপনা… অনেকটা সংহত হইয়া এখন… 'পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন' আকার ধারণ করিয়াছে।

এই অ্যাজিটেশনের মধ্যে একটা ভাব এই লক্ষ্য হয় যে, আমাদের

নিজের কিছুই করিবার নাই। কেবল পশ্চাৎ হইতে মাঝে মাঝে গবর্ন্‌মেণ্টের কোর্তা ধরিয়া যথাসাধ্য টান দেওয়া আবশ্যক।...

যদি কোনো দুঃসাহসিক ব্যক্তি এমন কথা বলেন যে কেবল গবর্ন্‌মেণ্ট্‌কে ডাকাডাকি না করিয়া আমাদের নিজের হাতেও কিছু কাজ করা আবশ্যক, তাহা হইলে সে কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে ইচ্ছা করে।...

ইহার কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত।... জাতির মধ্যে উদ্যম সত্যপরতা আত্মনির্ভর সৎসাহস না থাকিলে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া রেপ্রেজেণ্টেটিব গবর্ন্‌মেণ্ট্‌ ভিক্ষা চাহিতে বসা বিড়ম্বনা। আমার মনে হয় আমাদের দেশের লোকদের ডাকিয়া ক্রমাগত এই কথা বলা আবশ্যক যে, ইংরেজ গবর্ন্‌মেণ্টের প্রসাদে সুশাসন প্রভৃতি যে-সকল ভালো জিনিস পাইয়াছি, কোনো জাতি সেগুলি পড়িয়া পায় নাই, তাহার জন্য বিস্তর যোঝাযুঝি সংযম আত্মশিক্ষা ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে।... পড়িয়া পাওয়াকে পাওয়া বলে না, কেননা তাহার স্থায়িত্ব নাই, তাহাতে কেবল নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট ভাবে সুখে থাকা যায় মাত্র—কিন্তু তাহাতে জাতীয় চরিত্রের বিশেষ উন্নতি হয় না। আমরা যে সুখ পাইতেছি আমরা তাহার যোগ্য নহি, আমরা যে দুঃখ পাইতেছি সে কেবল আমাদের নিজের দোষে। এ কথা শুনিলে লোকে অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া উঠিবে না— এ কথা কেবলমাত্র জয়ধ্বজায় লিখিয়া উড়াইয়া বেড়াইবার কথা নহে—এ কথার অর্থ নিজে কাজ করো, ধৈর্যসহকারে শিক্ষালাভ করো, বিনয়ের সহিত গভীর লজ্জার সহিত আপনার দোষ ও অযোগ্যতা স্বীকার করিয়া তাহা আপন যত্নে দূর করিবার চেষ্টা করো, যাহাদের কাছে সহস্র বিষয়ে ঋণী আছ তাহাদের ঋণ স্বীকার করো, সে ঋণ ধীরে ধীরে শোধ করো।...

আশ্বিন ১২৯৬

৪

সেকালের ধনী জমিদারগণ নবাব-সরকারে প্রতিপত্তি ও পদবীলাভের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেন ও কোনো চেষ্টা করিতেন কিনা তাহা আমরা ভালোরূপ জানি না।··· কিন্তু তখনকার যাহা সাধারণ হিতকার্য, অর্থাৎ দিঘি-খনন, মন্দির-স্থাপন, বাঁধ-নির্মাণ, এই-সকলকেই তাঁহারা যথার্থ কীর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন— খেতাব-লাভকে নহে। দশের নিকট ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রবল ছিল। তখন এই-সকল হিতকার্য রাজসম্মানের মূল্যস্বরূপ ছিল না, ইহাতে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিত। সেই সাধারণের সম্মানের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা ছিল না। রানী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহারা তৎকালীন নবাবদত্ত বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা উজ্জ্বল নহেন, ইঁহারা বিচিত্র কীর্তি -দ্বারা লোকসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে আপন অক্ষয় মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন। তখন জনগণের নিকট হইতে হিতকারী দেশপতিগণ যে খেতাব লাভ করিতেন, তাহা আধুনিক দেশী বিলাতি সর্বপ্রকার খেতাবের অপেক্ষা অনেক উচ্চ; তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

আর্তানাম্ ইহ জন্তুনাম্ আর্তিচ্ছেদং করোতি যঃ
শঙ্খচক্রগদাহীনো দ্বিভুজঃ পরমেশ্বরঃ। ···

বর্তমান জমিদারগণ যদি সেকালের দৃষ্টান্ত -অনুসারে, কেবল রাজার মুখ না চাহিয়া, খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, জনহিতসাধন ও দেশের শিল্প-সাহিত্যের রক্ষণপালনে সহায়তা করেন, তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া উঠে।···

দেশীয় রুচি এবং শিল্প এখনও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের আদর পায়, কিন্তু তাহাও ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিলাতি রুচির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি পণ্য তাঁহাদের গৃহ হইতে দেশের শিল্পকে অবমাননা-সহকারে

নির্বাসিত করিয়া দিতেছে।

সাহেবের জন্য তাঁহারা অনেক করেন, কিন্তু সাহেবেরা চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগকে দেশীয় সাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা করিতে পারিবেন না। কারণ, ইংরাজ রাজা অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারেন না। যদি তাঁহারা আপন পুরাতন উচ্চস্থান অধিকার করিতে চাহেন তবে গবর্মেন্ট্-প্রাসাদের গম্বুজটার দিকে অহরহ ঊর্ধ্বমুখে না তাকাইয়া, নিম্নে একবার দেশের দিকে, সাধারণের দিকে, মুখ ফিরাইতে হইবে।

ভাদ্র ১৩০৫

৫

…ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আমাদের খুব বেশি ব্যঞ্জনে দরকার নাই, যেটুকু আহার করিব নিজে যেন আহরণ করিতে পারি; খুব বেশি সাজ-সজ্জা না হইলেও চলে, মোটা কাপড়টা যেন নিজের হয়; এবং দেশকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আমরা যতটুকু নিজে করিতে পারি, তাহা যেন সম্পূর্ণ নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এক কথায়, যাহা করিব আত্মত্যাগের দ্বারায় করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জনের দ্বারায় পাইব, যাহা দিব আত্মদানের দ্বারাতেই দিব। এই যদি সম্ভব হয় তো হউক— না যদি হয়, পরে চাকরি না দিলেই যদি আমাদের অন্ন না জোটে, পরে বিদ্যালয় বন্ধ করিবামাত্রই যদি আমাদিগকে গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, এবং পরের নিকট হইতে উপাধির প্রত্যাশা না থাকিলে দেশের কাজে আমাদের টাকার থলির গ্রন্থিমোচন যদি না হইতে পারে, তবে পৃথিবীতে আর কাহারও উপর কোনো দোষারোপ না করিয়া যথাসম্ভব সত্বর যেন নিঃশব্দে এই ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ভিক্ষাবৃত্তির

তারস্বরে, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায়, রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ না করি। যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোনো বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে, হে মহামারী, তুমি আমাদের বান্ধব— হে দুর্ভিক্ষ, তুমি আমাদের সহায়।

কার্তিক ১৩০৯

৬

বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে।··· রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই, এমন-তরো নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।···

শিক্ষা এবং ঐক্য এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্ম-রক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার প্রতি ঘা পড়িয়াছে এমন যদি সন্দেহমাত্র মনে জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠিবার কথা।···

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।···

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া

উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্‌বেল হইয়া উঠিবে— তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন; এই পূর্বপশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্ত-স্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক্ করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণ-গুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।…

যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে, সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্তব্য আমাদেরই, সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে, সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ নিরাশ্বাস হইব না। এ কথা কোনো-মতেই বলিব না যে, গবর্মেণ্ট্ একটা কী করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল— তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে, তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো ভিক্ষা-লব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব— তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির

মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না।…

জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

৭

…নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ নিজেকে অর্জন করিতে হইবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নূতনত্ব কোথায়? পুরাতন কথা বলিতেছি— এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব।…

…আমাদের এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন, যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারও কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত, তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত— আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যানুশীলন আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাইতেছি, সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য… আমাদের দেশে পরমুখাপেক্ষী কর্মহীন সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ যে নিরুপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে,

সে কেবল এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্য…

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তখন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব তাহাকে কার্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে। ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গম্ভীর, যাহা-কিছু মহৎ, তাহা সমস্ত উদ্‌বোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে। ইহাকে আমরা ঐশ্বর্য দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা ঐশ্বর্য লাভ করিব।…

এ কথা একবার ভাবিয়া দেখো, মাতাকে তাহার সন্তানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্যভার যদি অন্যে গ্রহণ করে, তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশহিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিতকর্ম আগ্রহপূর্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা।…

…স্বদেশপ্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের সেবা করিবার একটা সুযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে, যেখানে দেশ জিনিসটা যে কী তাহা ভূরিপরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না; যেখানে সেবাসূত্রে দেশের ছোটো বড়ো, দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।

দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক স্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্তব্যবুদ্ধিকে এক স্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য, আমি যে একটি স্বদেশীসংসদ

গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি, তাহা যে একদিনেই হইবে— কথাটা পড়িবামাত্রই অমনি যে দেশের চারি দিক হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে— এমন আমি আশা করি না। স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকে খর্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ-সমস্ত কাজের লোকের গুণ— কাজ করিতে করিতে এই-সকল গুণ বাড়িয়া উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উল্‌টা হয়— এই-সকল গুণের পরিচয় যে আমরা প্রথম হইতেই দেখাইতে পারিব তাহাও আমি আশা করি না। কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা যত ক্ষুদ্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন সকল খাঁটি লোক, শক্ত লোক যাঁহারা আছেন, যাঁহারা দেশের কল্যাণকর্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন এবং সেই কর্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে এক জন অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বে বরণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে। সুবিস্তীর্ণ আরম্ভের অপেক্ষা করা, সুবিপুল আয়োজন ও সমারোহের প্রত্যাশা করা কেবল কর্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া। এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না।

চৈত্র ১৩১১

৮

··· এই-যে বাংলাদেশ ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে··· আমরা যেন ভালোবাসিয়া তাহার মৃত্তিকাকে উর্বরা করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মনুষ্যত্বলাভে সাহায্য করি। যাহাকে এমনি সত্যরূপে জানি ও সত্যরূপে ভালোবাসি, তাহাকেই আমরা সকল দিক দিয়া এমনি করিয়া সাজাই, সকল দিক হইতে এমনি করিয়া সেবা করি এবং সেই আমাদের সেবার সামগ্রী প্রাণের ধনের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই না।

আমি যে একা আমি নহি— আমার যেমন এই ক্ষুদ্র শরীর তেমনি আমার যে একটি বৃহৎ শরীর আছে— আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেহের বিস্তার, তাহারই স্বাস্থ্যে যে আমারই স্বাস্থ্য, আমার সমস্ত স্বদেশীদের সুখদুঃখময় চিত্ত যে আমারই চিত্তের বিস্তার, তাহারই উন্নতি যে আমারই চিত্তের উন্নতি —এই একান্ত সত্য যতদিন আমরা না উপলব্ধি করিয়াছি, ততদিন আমরা দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, দুর্গতি হইতে দুর্গতিতে অবতীর্ণ হইয়াছি— ততদিন কেবলই আমরা ভয়ে ভীত এবং অপমানে লাঞ্ছিত হইয়াছি।···

কার্তিক ১৩১২

৯

···স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে।··· দেশের সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর দান করিতে না পারি,

যদি সেইখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনোপ্রকার কর্মনীতি ও কর্মসংকল্প না থাকে, তবে আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিষ্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে।

যদি সকলে মিলিয়া একটা কাজের আয়োজন গড়িয়া তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না হইয়া থাকে তবে অগত্যা আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা অসময়ে ঔদ্ধত্য করিতে থাকি, সেই বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ক্ষেত্র একেবারে নষ্ট হয়। গর্ভিণীকে সমস্ত অপঘাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া সাবধানে চলিতে হয়— সেই সতর্কতা ভীরুতা নহে, তাহা তাহার কর্তব্য।

আজও আমাদের দেশ সম্মিলিত কর্মচেষ্টায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, একক চেষ্টার যুগে আছে, এ কথা যখন তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটিমাত্র পরামর্শ এই আছে— সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেলো, স্থির হও, কোনো কথা বলিয়ো না, অহরহ অত্যুক্তিপ্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর-কিছু না পারো খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে— সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে

অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো। মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে শক্তি কেবলই নষ্ট করিতেছি, সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদি আমাদিগকে সামান্য বলিয়া, ছোটো বলিয়া অপবাদ দেয়, উপহাস করে, তবে তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে।...

আমার নিবেদন এই, এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংযত অভিমান মনের তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার করিবে। এতদিন যে-সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে টানিতে পারিত না, সেই-সমস্ত কাজে আজ মন দিবার মতো ধৈর্য আমাদের জন্মিবে।

কাজের কি অন্ত আছে! আমরা কিছুই কি করিয়াছি! একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে। আমাদের 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'। সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়— শুদ্ধমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ। এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে। ইহার জন্য আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, কতটুকুই বা করিতেছি এবং ইহাকে জানিবার জন্যই বা আমাদের চেষ্টা কত সামান্য! নিজের মন এবং ব্যবহার সত্যরূপে আলোচনা করিয়া সত্য করিয়া বলো দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য কী সুগভীর! ইহার কোন্ দুঃখে, কোন্ অভাবে, কোন্ সৌন্দর্যে, কোন্ সম্পদে আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে, নানা দিক হইতে আমাদের

নানা লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থ্যের বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে? আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালি যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানের এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। সকল বিষয়ে সকল কাজই বাকি পড়িয়া আছে।

...মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষলক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা এক সময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশকুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে— নূতন বা পুরাতন বা যে দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়? তাঁহাদের প্ল্যান কী? তাঁহাদের আয়োজন কী? কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই— ইহা মনুষ্যস্বভাবের ধর্ম— কেবলই মদ জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া যাওয়া না হয়। যে অসংযম চরিত্রদুর্বলতার বিলাসমাত্র তাহাকে সবলে ঘৃণা করিয়া কর্মের নিঃশব্দ নিষ্ঠার মধ্যে আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে— এ-সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করি।

শ্রাবণ ১৩১৪

১০

আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার —এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু, যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে

দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি, তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এই জন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে, বহুকাল পূর্বে 'স্বদেশী সমাজ' -নামক প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে-কোনো ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয়— নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতি-সাধনের জন্যে যে উপলক্ষে আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। কারণ, ইংরেজ-রাজসরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়; এইজন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই, অর্থাৎ আত্মার মূল্যে সফলতা পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

> ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।
> আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি॥

দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দেশ আমারই আত্মা, এই জন্যই দেশ আমার প্রিয়—এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।

কার্তিক ১৩২৮

১১

…আজ আপনাদের অভিনন্দন শুনে বুঝলাম যে আমাকে আপনাদের স্মরণ আছে।… দেখলাম একটি কথা আপনাদের মনে আছে। সেটি এই— সে আজ হয়তো ত্রিশ বৎসর হল, সেদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বারবার বলেছিলাম যে, নিজের শক্তিতে নিজের অভাব দূর করবার ভার যদি আমরা না নিলাম তা হলে দেশকে পাওয়াই হল না। এই কারণে সেদিন যখন জলের জন্য, অন্নের জন্য, জ্ঞানবিস্তারের জন্য, অস্বাস্থ্য-নিবারণের জন্য, আমাদের লোকেরা রাজদ্বারে সম্মিলিত কণ্ঠে ভিক্ষা করবার উদ্দেশে সভায়-সভায় সংবাদপত্রে-পত্রে কখনো বা মিনতি, কখনো বা অভিমান, কখনো বা ক্রোধের তাড়নায় রাজভাষা আলোড়িত করে তুলছিলেন…আমি সেই আবেদনের পুনঃপুনঃ পুনরাবর্তনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। তার কারণ কেবল এই অত্যন্ত বাহুল্য কথা নয় যে, দেশের হিতসাধনের চেষ্টায় দেশের অভাব ও দুঃখ দূর হতে পারে— তার আর-একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের রাজশক্তির সঙ্গে যদি ব্যবহার করতে হয় তবে সেটা ভিক্ষুকের মতো করলে চলে না। আত্মশক্তি-দ্বারা দেশকে যে পরিমাণে আয়ত্ত করতে পারব সেই পরিমাণেই রাজ-শক্তির সঙ্গে সমকক্ষভাবে আমাদের ব্যবহার চলতে পারবে। এক পক্ষে কেবল প্রার্থনা, অন্য পক্ষে কেবল দাক্ষিণ্য, এর মাঝখানে যে ফাঁক সেটা অসীম। সে আমাদের আত্মাবমাননার প্রকাণ্ড গহ্বর। তখনকার

কালের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি দুই অসমানের মিলনের সেতু নির্মাণ করতে লেগেছিল। আমি তখন বলেছিলাম— অসাম্যের মিলন অসম্মানের মিলন।

আমি বলেছিলাম ভিক্ষা নেব না, নিজের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করার দ্বারাই নিজের দেশকে অধিকার করব। এরই সঙ্গে আরো-একটি কথা আপনিই এসে পড়ে— সে হচ্ছে এই যে, শুধু যে নেব না তা নয়, দেব। যে দিকে নিজের দারিদ্র্য আছে, অজ্ঞান আছে, অস্বাস্থ্য আছে, সে দিকে অভাবপূরণের জন্য নিজের শক্তি সচেষ্ট হয়ে থাকবে, কিন্তু যে দিকে আমাদের পূর্ণতা সে দিকে দেবার দায়িত্বই আমাদের। আমরা যে বর্বর নই তার প্রমাণ দিতে হলেই ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে হবে। সে পরিচয় তো দানের দ্বারা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা মানুষকে এমন কিছু দিয়ে গেছেন যা চিরকালের দান; অহংকার করবার বেলায় সে কথা আমরা বলি, ব্যবহার করবার বেলায় সে কথা আমরা ভুলি — তাতেই তো আমাদের পিতামহদের গৌরবকে ম্লান করে দিয়ে থাকি। তাঁরা বলেছিলেন, আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা— সব জায়গা থেকে সবাই আমাদের কাছে আসুক। এত বড়ো নিমন্ত্রণ কোনো দরিদ্র করতে পারে না।…

চৈত্র ১৩৩২

১২

স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেক-গুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির

সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তাতে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণ-সাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো না কোনো আকারে গ্রহণ ক'রে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপ'কে জাগিয়ে তুলেছে, এমন-সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কাকে বলে সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর প'রে, কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিসটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তা হলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। তা হলে আত্মপ্রভাবের যে কী মূল্য তা বুঝতে পারব; ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না; এই জন্যে তাদের পরস্পর মিলনের কোনো গভীর উপলক্ষ নেই। দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন।

নানা পথে এক লক্ষ্য -অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশসৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। যদি এই রকম উদ্‌যোগকে আমরা আয়তনে ছোটো বলে অবজ্ঞা করি তবে গীতার সেই কথাটা যেন মনে আনি— স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সত্যের জোর আয়তনে নয়, তার আপনাতেই।

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব— আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসঙ্ঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিদ্ধি সিদ্ধিকে টানে— তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে আনে। বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ, অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষ-সাধন হয়। যে মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্‌যোগ করছে তাকে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারই কাজে স্বরাজসাধনার সত্যকার আরম্ভ

বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয় তা হলেই বুঝব— গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্ছে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজলাভ। পরিমাণ হিসাবে কম হলেও সত্য হিসাবে কম নয়। অর্থাৎ শতকরা একশ'র হারে লাভ না হলেও হয়তো শতকরা একের হারে লাভ; এই লাভই শতকরা একশ'র সগোত্র, এমন-কি সহোদর ভাই। যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দ-বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে, সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না— স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

আশ্বিন ১৩৩২

১৩

আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ব'লে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি ব'লেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য

অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথা··· সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

পরিশিষ্ট
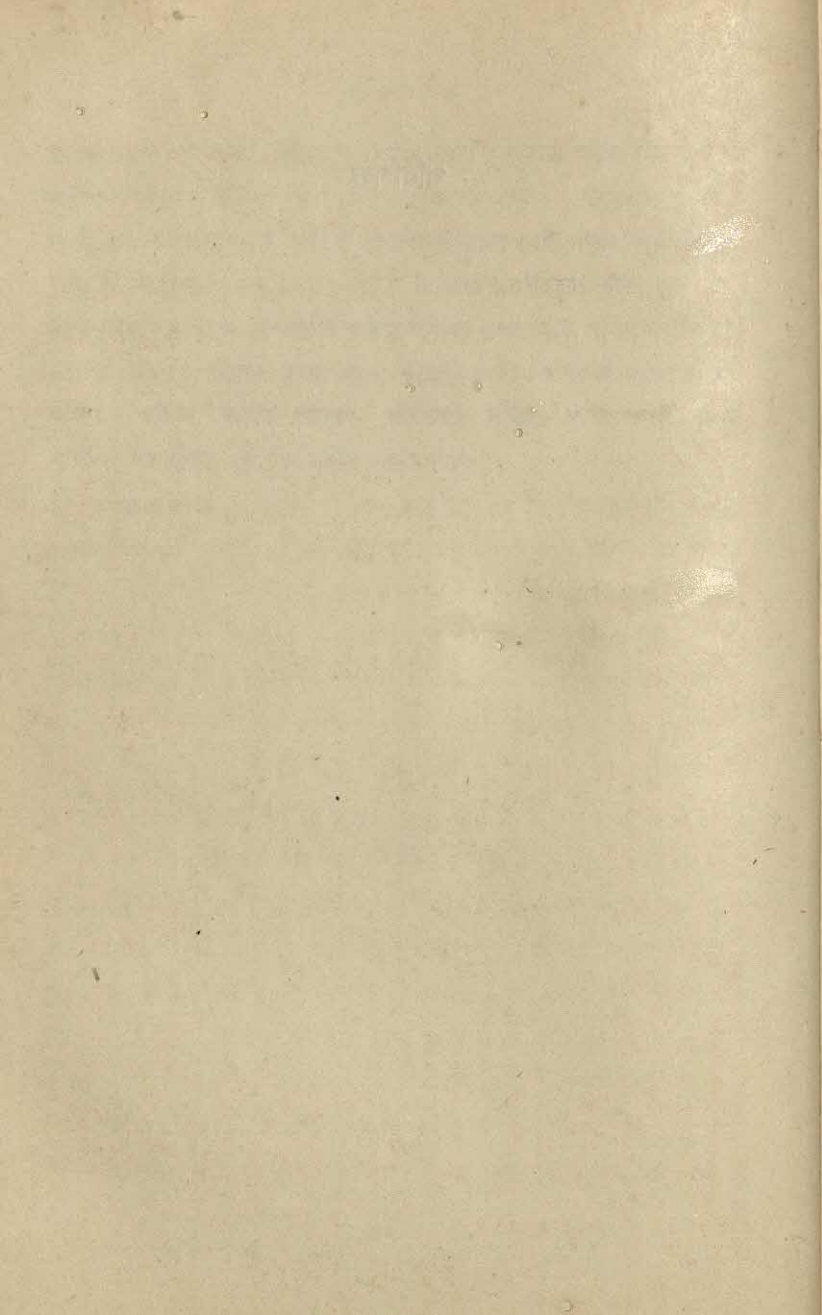
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক

বর্জিত রচনাংশ

বঙ্গদর্শন (১৩১১) ও আত্মশক্তি (১৩১২) উভয় স্থলেই 'স্বদেশী সমাজ' ও "স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' উভয়ের বিস্তৃততর পাঠ দেখা যায়। বঙ্গদর্শনের যে অংশগুলি সমূহ (১৩১৫) বা বর্তমান গ্রন্থ হইতে বর্জিত (অনেক সময় আত্মশক্তি হইতেও বর্জিত) সংখ্যার সংকেতে সেগুলির স্থান-নির্দেশ-পূর্বক অতঃপর সংকলিত হইল। প্রবন্ধের সূচনায় (বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৫) বর্জিত—

[১]'সুজলা সুফলা' বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক-পক্ষীর মতো ঊর্ধ্বের দিকে তাকাইয়া আছে, কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরু গুরু মেঘগর্জন শুরু হইয়াছে— গবর্মেণ্ট্ সাড়া দিয়াছেন— তৃষ্ণানিবারণের যা-হয়-একটা উপায় হয়তো হইবে— অতএব আপাতত আমরা সেজন্য উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্বে আমাদের যে-একটি ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত, দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না?

আমাদের যে-সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই নাহয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কর্জন্‌সাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, নাহয় অ্যান্‌ড্রুয়ল-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভরতি করিতে থাকুন; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্বালাময় তরলরসের তৃষ্ণা, যাহা প্রলয়-কালের সূর্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে, তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিমদিগ্‌দেবী

তাহার পরিবেশনের ভার লইলে অসংগত হয় না। কিন্তু জলের তৃষ্ণা তো স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিস। ব্রিটিশ গবর্মেন্ট আসিবার পূর্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালোরূপেই হইয়া আসিয়াছে— এজন্য শাসনকর্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন তো চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

পৃ ৫, প্রথম অনুচ্ছেদের পরে—

[২] দেশে এই যে-সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনী-দরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এ জন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে সুদীর্ঘমন্তব্য-সহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে! নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্তচলাচলের জন্য যেমন টৌনহল-মীটিং অনাবশ্যক, সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

পৃ ৯, প্রথম অনুচ্ছেদের শেষে বঙ্গদর্শনে ছিল—

[৩]সেই জন্যই আজও আমাদের মাথা একেবারে মাটিতে গিয়া ঠেকিতে পায় নাই।

পৃ ৯, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রথম বাক্যের পর—

[৪]এমন-কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি— কোনো আপত্তি করি নাই।

পৃ ১০, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ ছত্রের অন্তর্বর্তী অংশ—

স্বস্থ অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্তক অব্যবহিত উত্তেজনা শরীরের মধ্যেই থাকে— যখন মৃগনাভি, অ্যামোনিয়া, সাপের বিষ দিয়া শরীরকে সক্রিয় করিতে হয়, তখন অবস্থাটা নিতান্ত সংশয়াপন্ন। আজকাল আমাদের সমাজশরীরের আভ্যন্তরিক উত্তেজনা ইহাকে কোনো কাজেই প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না, বৈদ্যমহাশয়ের বড়ি না হইলে একেবারে অচল।

পৃ ১০, ঊনবিংশ ও বিংশ ছত্রের মধ্যে বঙ্গদর্শনে ছিল—

কে বলে জলকষ্টনিবারণের সামর্থ্য আমাদের নাই? একদা দেশের যে অর্থ দেশের কল্যাণকর্ম সাধন করিয়া চরম সার্থকতা লাভ করিত, আজ সেই অর্থ অজস্রধারায় মিল্‌টনের আড়গড়া, ডাইকের গাড়িখানা, ল্যাজারসের আসবাবশালা, হার্মান কোম্পানির দরজির দোকানকে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে! স্বদেশের শুষ্কতালুতে জলবিন্দু দিবার বেলায় টানাটানি না পড়িবে কেন?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, লেডি ডফ্‌রিন ফন্‌ডে, ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের ঘোড়দৌড়ে, লাট সাহেবের অভ্যর্থনায় টাকা ঝরিয়া পড়িতেছে কখন? যখন, সেই-টাকা-জোগান-কারী প্রজার দল দীপ্ত মধ্যাহ্নে পানীয় জলের জন্য হাহাকার করিতেছে, যখন ম্যালেরিয়ায় তাহারা উৎসন্ন হইয়া গেল, যখন তাহাদের গোরু বাছুর চরিবার এক ছটাক জমি নাই, যখন তাহাদের নিম্নভূমির উপর হইতে বর্ষার পর তিন-চার-মাস ধরিয়া জলনিকাশের কোনো উপায় থাকে না!

আর যাঁহারা পল্লী হইতে বাহির হইয়া সামান্য অবস্থা হইতে ধনী-অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদেরও ধনের আড়ম্বর করিবার স্থান

সদরে এবং আড়ম্বরের উপায়ও বারো-আনা বিলাতী। ইহাতে যে টাকাগুলাই কেবল বাহিরে চলিয়া যায় তাহা নহে, হৃদয়ও দেশে থাকে না। রুচির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, আচরণের দ্বারা প্রতি মুহূর্তে যাহাকে অবজ্ঞা করি, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে কেবল আর্থিক শক্তির অভাব ঘটে তাহা নহে— চিত্তশক্তিও থাকে না। সুতরাং তখন দেশহিতৈষিতার সর্বপ্রধান বুলি এই হইয়া দাঁড়ায় যে, 'আমরা নিজে কিছুই করিতে পারিব না, কারণ আমরা গাড়িজুড়ি কোট্ বুট্ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। হে সরকার, আমরা 'লয়াল', অতএব তুমিই সমস্ত করিয়া দাও— যদি না করো তবে গালি দিব।'

পৃ ১১, উদ্ধৃতির পরে বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়—

[১]এইজন্য কবিকথিত 'স্রোতের সেঁওলি'র মতো ভাসিয়াই চলিয়াছি।

এরূপ অবস্থা কোনোমতেই চিরকাল থাকিতে পারে না। এইজন্য আপাতত স্রোতের অত্যন্ত প্রাবল্য দেখিলেও মনকে হতাশ হইতে দিই না। ইহাও তো দেখা গেছে এক সময় ইংরাজি-রচনার চর্চা দেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল, তখনকার শিক্ষিত যুবকেরা বাংলাভাষাকে একান্তমনে ঘৃণা করিতেন। তখন কি কেহ কল্পনাও করিতে পারিত যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলাভাষায় আধুনিক কাব্যসাহিত্যের প্রথম অবতারণা করিবেন এবং রিচার্ড্সনের প্রিয় ছাত্র বাংলাভাষায় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা লিখিতে অগৌরব বোধ করিবেন না?

যেমন সাহিত্যে, তেমনি সকল দিকেই স্রোত ফিরিবে— ঘরে আসিতেই হইবে। চারি দিকে তাহার লক্ষণ দেখা দিতেছে।

বাঙালীর সাহিত্যপ্রিয়তা একবার বাহিরে ফিরিয়া আসিবার ফলে,

আমরা দেখিতেছি বঙ্গসাহিত্য আজ তাহার পৈতৃক সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত ছাড়াইয়া গেছে। তাহার বিচিত্রশক্তি আজ নানা দিকে নানা আকারে আপনাকে নানা পথে ধাবিত করিয়াছে। তেমনি যাহাদের হৃদয় একবার বাহিরে ঘুরিয়া অবশেষে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা ঘরকে বড়ো করিয়া তুলিবে।

বিধাতা এই জন্যই আমাদিগকে এমন করিয়া সকল দিক দিয়া ঘর হইতে খেদাইতেছেন— বাহিরটাকে এমন জবরদস্তি করিয়া বারংবার আমাদের রুদ্ধদ্বারের উপর সবলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে ঘর-বাহিরের একটা বৃহৎ সামঞ্জস্য করিবেন। যেখানে পল্লীজীবনযাত্রার আয়োজন ছিল, সেখানে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিচিত্র উপকরণ আহরণ ও সঞ্চয় করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; যেখানে অমরা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, সেখানে বৃহত্তরভাবে আমরা স্বাধীন হইব। এখন আমাদের সমাজ নির্জীবভাবে সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবে না, সজীব হইয়া সকলের সহিত যোগস্থাপন করিবে— পল্লীর সহিত পল্লী, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়, দেশের সহিত দেশ, গাঁথিয়া এক হইয়া যাইবে। বিচ্ছেদে প্রেমকে প্রবল, মিলনকে ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলে —এ কথা পুরাতন। একবার হারানোর ভিতর দিয়া পাওয়া প্রকৃষ্টরূপে পাইবার উপায়। আমরা যে মাঝে একবার আপনাকে হারাইয়াছিলাম, সে কেবল আপনাকে প্রবলভাব বৃহৎভাবে ফিরিয়া পাইবার জন্য। আধুনিক ভারতবর্ষ আপনার পল্লীর প্রান্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল— এক কালে যাহা বৃহৎ ছিল তাহা সংকীর্ণ, যাহা সমগ্র ছিল তাহা খণ্ডিত, যাহা সজীব ছিল তাহা জড়, যাহা জ্ঞানগত ছিল তাহা প্রথাগত অভ্যাসগত হইয়া আসিয়াছিল। এইবার পশ্চিমের আঘাতে জাগিয়া উঠিয়া ভারতবর্ষ কি

একটা সম্পূর্ণ পৃথক ধার-করা জীবন আরম্ভ করিবে? তাহা নহে। সে আপনাকে উজ্জ্বলভাবে প্রবলভাবে ফিরিয়া পাইবে— যাহা বদ্ধ ছিল তাহাই মুক্তি পাইবে, যাহা স্তব্ধ ছিল তাহাই চারি দিকে আপন কাজে প্রবৃত্ত হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি— বাঙালির চিত্ত ঘরের মুখ লইয়াছে নানা দিক হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে এবং স্বদেশী ভাষা স্বদেশী সাহিত্যের দ্বারা অলংকৃত হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে— স্বদেশের শিল্পদ্রব্য আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, স্বদেশের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজদ্বারে ভিক্ষাযাত্রার জন্য যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা প্রত্যহই একটু একটু করিয়া আমাদিগকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে। দেশে বিজ্ঞানশিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা স্বদেশী লোকের কাছেই প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছি এবং সম্প্রতি বর্ধমান প্রোভিন্‌শ্যাল্‌ কন্‌ফারেন্সের সভাপতি আমাদের সুদীর্ঘকালের পোলিটিক্যাল উদ্যমকে জাতীয় আত্মনির্ভরতাচর্চায় খাটাইবার জন্য শ্রোতাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

এমন অবস্থায় দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অদ্ভুত অসংগতি আমাদের চোখে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

পৃ ১১, দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ছত্রের যোগসাধক ছিল—

"তাই আমাদের হাবভাববিলাসের চর্চা সমস্তই পূরা রকমে বিলাতি

---

* * বর্তমান গ্রন্থে রূপান্তরিত : ইহাতে আমাদের নানা কাজে যে কিরূপ অসংগতি ঘটিতেছে

ধরণের হইয়াছে। কিন্তু বিলাতের মন তো ভুলাইতে পারিলাম না, বারংবার তো মাথা হেঁট করিয়া ফিরিতে হইল। এখন এ-সমস্ত মিথ্যা ছলাকলা ফেলিয়া দিয়া একবার দেশের মনকে পাইবার জন্য দেশী প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি? কারণ

পৃ ১১, শেষ ছত্রে 'কিন্তু'র পরে—

[৯]দেশের হৃদয়ের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া,

পৃ ১৫, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ ছত্রের অন্তর্বর্তী—

[১০]এ কথা শুনিবামাত্র যেন আমাদের মধ্যে হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া না ওঠেন— এ কথা না বলিয়া বসেন যে, এই মেলা-গুলির প্রতি গবর্মেন্টের অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে, অতএব আমরা সভা করিয়া কাগজে লিখিয়া প্রবলবেগে গবর্মেন্টের সাঁকো নাড়াইতে শুরু করিয়া দিই, মেলাগুলার মাথার উপরে দলবল-আইন-কানুন-সমেত পুলিশ কমিশনার ভাঙিয়া পড়ুক, সমস্ত এক দমে পরিষ্কার হইয়া যাক। ধৈর্য ধরিতে হইবে— বিলম্ব হয়, বাধা পাই, সেও স্বীকার, কিন্তু এ-সমস্ত আমাদের নিজের কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘর নিকাইয়া আসিয়াছেন, ম্যুনিসিপালিটির মজুর নয়। ম্যুনিসিপালিটির সরকারি ঝাঁটায় পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে এ কথা আমরা যেন না ভুলি।

পৃ ১৫, অষ্টাদশ ও উনবিংশ ছত্রের মধ্যে—

[১১]এইখানে সবিনয়ে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি যে একটা নূতন-পন্থা-উদ্‌ভাবনকারী দলের মধ্যে একজন এরূপ স্পর্ধার লেশমাত্র

আমার মনে নাই। জাহ্নবী অনেকটা পথ পূর্বমুখে চলিয়া অবশেষে এক সময়ে দক্ষিণগামিনী হইয়া সমুদ্রলাভ করিয়াছেন, এজন্য দক্ষিণের পথ অহংকার করিবার অধিকারী নহে, বস্তুত তাহা পূর্বপথেরই অনুবৃত্তি মাত্র। দেশ যখন একদা জাগ্রত হইয়া 'কন্‌ষ্টিট্যুশনাল্ অ্যাজিটেশনে'র রেখা ধরিয়া রাজ্যেশ্বরের দ্বারের মুখে ছুটিয়াছিল, তখন সমস্ত শিক্ষিত-সমাজের বুদ্ধিবেগ তাহার মধ্যে ছিল। আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সেই স্রোতের পথ বাঁক লইবার উপক্রম করিতেছে। আশা করি এজন্য যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ বাহাদুরি লইবার চেষ্টা না করেন। যাঁহারা সাধনাদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, ধীশক্তিদ্বারা ইংরাজি-শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে স্বদেশের কার্যে চালিত করিয়াছেন, স্বদেশের কার্যে একাগ্র করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি। তাঁহারা যে পথে গিয়াছিলেন সে পথে যাত্রা যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ আমি কখনোই বলিব না। তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন আমাদের হৃদয় নিজের মধ্যে সেই উপায়ে একটা বিপুল ঐক্যের আভাস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যাহা বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা ঐক্যের অমৃতকণার আস্বাদে যখন আপনার মধ্যে আপনার যথার্থ বল অনুভব করিতে পারিতেছে, তখন সে আপনার সমস্ত শক্তিকে রাজপুরদ্বারে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এখন সে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে— এখন সে আত্মশক্তি আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতালাভের দিকে অনিবার্যবেগে চলিবে, কোনো-একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদলাভের দিকে নহে। এই-যে পথের দিক্-পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতেছে ইহা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের কৃতকর্ম নহে— যে চিত্তস্রোত প্রথমে এক দিকে পথ লইয়াছিল ইহা তাহারই কাজ, ইহা নূতন স্রোত নহে। যে অঙ্কুর প্রথম মৃত্তিকা

ভেদ করিয়া অজ্ঞাত আলোকের দিকে মাথা তুলিয়াছিল, পরবর্তী শাখা প্রশাখা যেন নিজেকে 'ওরিজিন্যাল' জ্ঞান করিয়া সেই অঙ্কুরকে সেকেলে বলিয়া উপহাস না করে।

গতবারে এ প্রবন্ধ যখন আমি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন আমার উক্ত কথাটি সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয় নাই। প্রতিবাদে এই কথা উঠিয়াছিল যে, দেশে নানা শক্তি নানা লোককে নানা দলকে আশ্রয় করিয়া কাজ করিবে, ইহাই দেশের স্বাস্থ্যের ও উন্নতির লক্ষণ। অতএব কেবলমাত্র সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না।

প্রবন্ধপাঠের শেষে এমন কথা যখন উঠিল তখন বুঝিলাম— আমার সমস্ত প্রবন্ধই ব্যর্থ হইয়াছে। আমি এই কথাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিলাতে যেমনই হউক, আমাদের দেশে সমাজ একটা ক্ষুদ্র ব্যাপার নহে— যুদ্ধবিগ্রহ, কিয়ৎপরিমাণে পাহারার কাজ ও কিঞ্চিৎপরিমাণে বিচারের কাজ ছাড়া দেশের আর-সমস্ত মঙ্গলকার্যই আমাদের সমাজ নিজের হাতে রাখিয়াছিল। ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। এইজন্য এই সমাজব্যবস্থার উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের সভ্যতা স্থাপিত এবং এইজন্য এই সমাজকে আমরা চিরদিন সর্বতোভাবে স্বাধীন ও সক্রিয় রাখিতে একান্ত সচেষ্ট ছিলাম। অতএব কে বলিল সমাজের কাজ বলিতে কেবল একটিমাত্র কাজ বুঝাইতেছে?

আমি যদি বলি শরীরের সমস্ত কাজ শরীরেরই করা উচিত, তবে কি কেহ এই বলিবেন আমি তাহার কর্মক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিয়া আনিতে বলিতেছি? শরীরের কাজ বিবিধ, শরীরের কর্মস্থানও বিপুল, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই— কিন্তু শারীরিক ক্রিয়া শরীরের নিজের জিনিস এ কথা চিরদিন ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। আমি যদি পরকে বলি তুমি আমার হইয়া হজম করিয়া দাও এবং সেরূপ হজম করা যদি

পরের দ্বারা সম্ভবপর হয়, তবে তাহাতে মঙ্গল নাই। ব্যবহারের অভাবে নিজের পাকস্থলীটিকে সম্পূর্ণ খোয়াইয়া পরাশ্রিতশ্রেণীয় জীবের ন্যায় চিরকাল পরের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া দিব্য পরিপুষ্টভাবে চোখ বুজিয়া থাকাকে গৌরবের বিষয় বলা চলে না। ইংরাজের পাকস্থলী তাহার স্টেটের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু স্টেট তাহার সমাজের বহির্ভুক্ত নহে। ইংরাজ সর্বদাই রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া ব্যাপৃত থাকে, কারণ রাজনীতি তাহার স্বকীয় কলেবরের মধ্যেই। আমরা তাহার নকল করিয়া পরের পাকস্থলীতে নিয়তই যদি আন্দোলন উপস্থিত করিতে যাই, তাহাতে কি আমাদের হজমের কোনো সহায়তা করিবে? যাহারা জাবর কাটে তাহাদের হজম করিবার বিধি একরূপ, যাহারা জাবর কাটে না তাহাদের হজম করিবার বিধি অন্যরূপ। জাবর কাটা হজম করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া যদি প্রমাণিত হয়, তথাপি তাহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

পৃ ২২, দশম ও একাদশ ছত্রের মধ্যে ছিল—

[১২]তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ-দ্বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়— দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না, এই জন্য অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানাঘরের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম আইন-কানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশীই হউক-না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে— শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুভব না করিব সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালোই বলো আর মন্দই বলো, গালিই দাও আর প্রশংসাই করো, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতালাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতেই হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

পূর্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল হইতে বাধ্য হইয়া পল্লীসমাজই খণ্ড-খণ্ড-ভাবে আপনার কাজ আপনি সম্পন্ন করিয়াছে, স্বদেশী সমাজ তেমন ঘনিষ্ঠ-ভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আজও আমাদের মনুষ্যত্ব আছে, কিন্তু আমাদের কর্তব্য ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে আমাদের চরিত্রে সংকীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে। সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে, এই জন্য যাহা ভাঙিয়াছে তাহার জন্য আমরা শোক করিব না— যাহা গড়িতে হইবে তাহার প্রতি আমাদের

সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আজকাল জড়ভাবে, যথেচ্ছাক্রমে, দায়ে পড়িয়া, যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহাই ঘটিতে দেওয়া কখনোই আমাদের শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

এক্ষণে, আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদ-সভা থাকিবে, কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে।

পৃ ২৪, শেষ অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ—

[১৩]কী করিয়া কলের সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হয়, কী করিয়া রাজার সহিত স্বদেশের সংযোগসাধন করিতে হয়, জাপান তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একই কালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব -সমন্বয় করিতে পারিব— আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশী সমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

পৃ ২৫, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ ছত্রের মধ্যে ছিল—

[১৪]অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয়তো সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে

পারেন। তাঁহারা বলিবেন— নির্বাচন করিব কী করিয়া, সবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে তো সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই-সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার-বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনোকালে কাজে নাবা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে— যেমন করিয়া হউক একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারি দিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া-তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো-একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে একদল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজরাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে— পূর্বে হইতে হিসাব করিয়া, কল্পনা করিয়া, আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব তাহাও লাভ করিব— সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের অভাবে কাজে

লাগিল না, সে শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা কলসের মতো শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি তিনি সকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও, সমাজের শক্তি, সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানির মতো সমস্ত লাভ-লোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই, কিন্তু বড়ো ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে এক-একটা বড়োদিন আসে, সেইদিন বড়োলোকের তলবে দেশের সমস্ত সালতামামি নিকাশ বড়োখাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল। আপাতত আমাদের কাজ— দপ্তর তৈরি রাখা, কাজ চালাইতে থাকা, যেদিন মহাপুরুষ হিসাব তলব করিবেন সেদিন অপ্রস্তুত হইয়া শির নত করিব না— দেখাইতে পারিব, জমার ঘরে একেবারে শূন্য নাই।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড়ো করিব, এত বড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো তাহা নহে। কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়ো। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে— মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি— আমার এই প্রস্তাব যদিবা অনেকে

অনুকূলভাবেও গ্রহণ করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এমন-কি, প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষ ত্রুটি ও স্খলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে থাকা আশ্চর্য নহে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। অদ্যকার সভামধ্যে আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই এ কথা বলিলেও পাছে অহংকার প্রকাশ করা হয়, এজন্য আমি কুণ্ঠিত আছি। আমি অদ্য যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে তাহা বলাইতে উদ্যত করিয়াছে। তাহা আমার কথা নহে, তাহা আমার সৃষ্টি নহে, তাহা আমা-কর্তৃক উচ্চারিতমাত্র। আপনারা এ শঙ্কামাত্র করিবেন না আমি আমার অধিকার ও যোগ্যতার সীমা বিস্মৃত হইয়া স্বদেশীসমাজগঠন-কার্যে নিজেকে অত্যুগ্রভাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব— আসুন, আমরা মনকে প্রস্তুত করি— ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে, চিত্তকে উদার করিয়া, কর্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতিসূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শত-সহস্র রক্ততৃষার্ত শিকড়- সমেত হৃদয়ের অন্ধকার গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্রবিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি— আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি— শুভ-ক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গলপ্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি —শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ধূপের পবিত্র গন্ধ উদ্‌গত হইতে থাক্— দেবতার অনিমেষ কল্যাণদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেশ আপনাকে সর্বতোভাবে সার্থক

বলিয়া একবার অনুভব করুক।

এই অভিষেকের পরে সমাজপতি কাহাকে তাঁহার চারি দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, কিভাবে সমাজের কার্যে সমাজকে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলিবার বিষয় নহে। নিঃসন্দেহ, যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের চিরন্তন সমাজপ্রকৃতির অনুগত তাহাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে, স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি নূতনকে যথাস্থানে যথাযোগ্য আসনদান করিবেন। আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও দলবিশেষের হাত হইতে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্য করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে— সমস্ত কলরব কোলাহলের মধ্যে আপনার গৌরবে তাঁহাকে দৃঢ়গম্ভীরভাবে অবিচলিত থাকিতে হইবে। কাল যদি তাঁহার অভিষেক হয়, তবে তাহার পরদিন হইতেই আমরা অনেকেই অবোধ বাচালের ন্যায় ক্রমাগত প্রশ্ন তুলিতে থাকিব— কী করা হইল, এ কাজগুলা শেষ হইল না কেন, এবার বৈশাখে বারো-আনা আম ঝড়ে পড়িয়া গেল কেন, আমার প্রতিবেশীর ভাগিনেয় 'গুণনিধি' উপাধি পাইল আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কী অপরাধ করিয়াছে? কোনো অনাবশ্যক কৈফিয়তের চেষ্টা না করিয়া এই-সমস্ত প্রশ্নবৃষ্টি তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে।

অতএব যাঁহাকে আমরা সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের দ্বারা বরণ করিব, তাঁহাকে এক দিনের জন্যও আমরা সুখস্বচ্ছন্দতার আশা দিতে পারিব না। আমাদের যে উদ্ধত নব্যসমাজ কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সম্মত না হইয়া নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতেছে, সেই সমাজের সূচিমুখকণ্টকখচিত ঈর্ষাসন্তপ্ত আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে, বিধাতা যেন তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে বল ও সহিষ্ণুতা প্রদান করেন— তিনি যেন নিজের অন্তঃকরণের মধ্যেই শান্তি ও কর্মের মধ্যেই

পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

এই স্থলে, বর্তমানে কে আমাদের সমাজপতি হইবার উপযুক্ত, তাঁহাদের একজনেরও নাম যদি না করি, তবে আমার পক্ষে অত্যন্ত ভীরুতা প্রকাশ পাইবে। শুদ্ধ তাহাই নহে, নাম করিলে আমার প্রস্তাবটি আরো সকলের কাছে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। অতএব এই ক্ষণে এই স্থানেই তাঁহার নামোল্লেখ করিবার জন্যও আমি প্রস্তুত হইতেছি।

যিনি এক দিকে আচার ও নিষ্ঠা -দ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপর দিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী; এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য যাঁহার অপরিচিত নহে, অন্য দিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ; যাঁহাকে দেশের লোক যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; যিনি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই; নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত; নানা বিরোধীপক্ষের বিরোধ-সমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতিসাধারণের সম্মাননীয় কর্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্যবান অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন; সেই স্বদেশ-বিদেশের-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধনসম্পদের মধ্যেও অবিচলিত, তপোনিষ্ঠ, ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। বুঝিতে পারিবেন নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার, মতামত, আচার-বিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি না— আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব, দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত

সমাজের শূন্য রাজভবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি। আপনারা সকলেও সমস্ত ক্ষুদ্রতর্ক ও কর্মহানিকর দ্বিধা, সমস্ত ব্যক্তিগত সংস্কারগত পক্ষপাতিত্ব, পরিহার করিয়া অদ্য সমস্বরে আমার সমর্থন করুন; অধিনায়ককে স্বেচ্ছাক্রমে বরণ করিয়া তাঁহার অধীনতা -স্বীকারপূর্বক আপনাকে স্বাধীন করুন এবং অদ্য হইতে ভিক্ষার ঝুলি-কাঁথা সমস্ত ছাই করিয়া পুড়াইয়া দেশের কার্যে দেশকে যথার্থভাবে প্রবৃত্ত করুন।

পৃ ৩২, অষ্টাদশ ও উনবিংশ ছত্রের মধ্যে—

[১৫]আমাদের ভারতের মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও জন্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রকে এক সীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন— মনস্তত্ত্বকেও যে তিনি কোনো একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া দাঁড় করাইবেন না, তাহা বলিতে পারি না।

পৃ ৩৪, বর্জিত শেষাংশ—

[১৬]একবার স্বীকার করো মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্য অদ্য আমরা প্রস্তুত হইলাম ; একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব ; একবার প্রতিজ্ঞা করো জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

পৃ ৩৫, বঙ্গদর্শন ও আত্মশক্তি গ্রন্থে '"স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' এই শিরোনামে * চিহ্ন দিয়া একটি পাদটীকায় বলা হয় : ইহা ইতিপূর্বে বঙ্গবাসীতে বাহির হইয়া গেছে। ইত্যাদি। এই প্রবন্ধের বর্জিত সূচনাংশ নিম্নে সংকলিত—

[১৭]'স্বদেশী সমাজ' -শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জন রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি, * তৎসম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য এ প্রশ্নগুলি তিনি আমার কাছে পাঠান নাই, হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্নোত্তরের মতো লিখিতে গেলে লেখা নিতান্তই আদালতের সওয়াল জবাবের মতো হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ খাপছাড়া লেখায় সকল কথা সুস্পষ্ট হয় না, এইজন্য সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আকারে আমার কথাটা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি।

পৃ ৪০-৪৩, † † চিহ্নের অন্তর্বর্তী অংশ বঙ্গদর্শনে বা আত্মশক্তিতে ছিল না। আত্মশক্তির প্রবন্ধান্তর হইতে গৃহীত।

পৃ ৪৪, একবিংশ ছত্রে 'প্রশ্ন উঠিয়াছে'র পূর্বপাঠ—

[১৮]গোস্বামিমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন

---

* গত ৭ই শ্রাবণ শুক্রবার মিনার্ভারঙ্গমঞ্চে চৈতন্যলাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে প্রবন্ধটি প্রথম পঠিত হইয়াছিল। তাহার পর পরিবর্ধিত আকারে ১৬ই শ্রাবণ রবিবার কর্জন-রঙ্গমঞ্চে ভাদ্রের বঙ্গদর্শন হইতে পুনঃপঠিত হয়।

পৃ ৪৬, 'ধুইয়া ফেলো, তোমার মণিমাণিক্যের' ইহার বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত পাঠ—

[১২] ধৌত করো, তোমার হীরামুক্তার

গ্রন্থপরিচয়
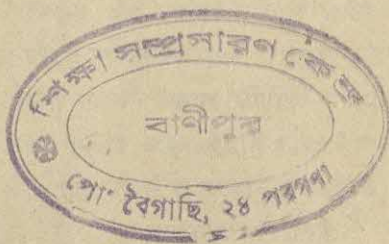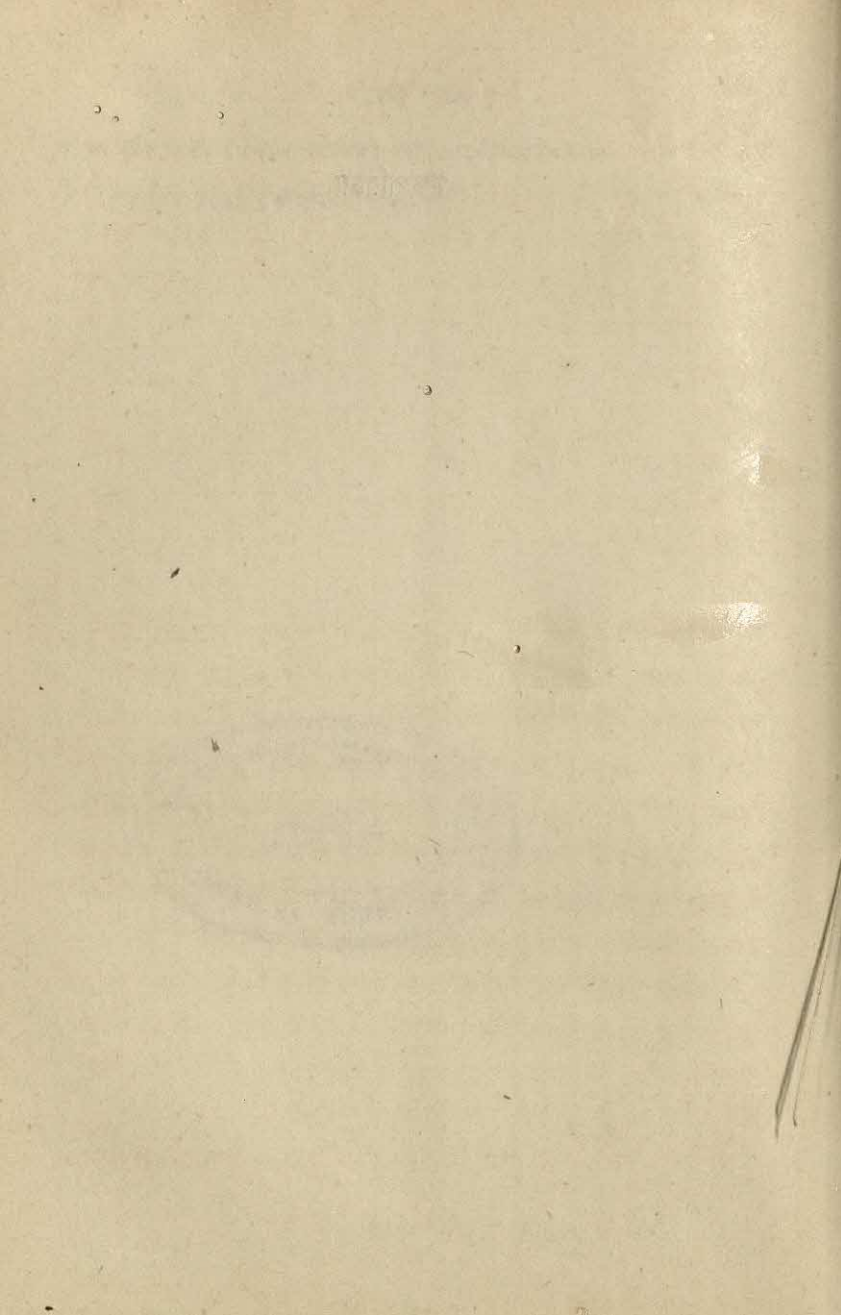
'যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে' এ বিষয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বারবার যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার কেন্দ্রবর্তী হইয়া আছে তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক যে-সকল তথ্য ও রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হইল।

১৩৩৬ সালে লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের যে 'মর্মকথা'র ব্যাখ্যান করেন, এই গ্রন্থের স্থচনায় তাহা মুদ্রিত হইল।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ [১৩১১ সালের] '৭ই শ্রাবণ শুক্রবার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য-লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে ··· প্রথম পঠিত হইয়াছিল। তাহার পর পরিবর্ধিত আকারে ১৬ই শ্রাবণ রবিবার কর্জন-রঙ্গমঞ্চে [১৩১১] ভাদ্রের বঙ্গদর্শন হইতে পুনঃপঠিত হয়।' প্রবন্ধে আলোচিত কোনো কোনো বিষয় ''স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা পুনর্বার করেন, ইহার কারণ সম্পর্কে উক্ত প্রবন্ধের স্থচনায় যাহা বলেন, তাহা 'সমূহ' বা বর্তমান গ্রন্থ হইতে বর্জিত হওয়ায়, পরিশিষ্টে যথাস্থানে (পৃ ১১৭) সংকলিত হইয়াছে।

'স্বদেশী সমাজ' ও ''স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' উভয়ই প্রথমে 'আত্মশক্তি' (১৩১২) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এবং পরে 'সমূহ' (১৩১৫) গ্রন্থে সংকলিত হয়। আত্মশক্তি গ্রন্থ রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

'সমূহ' -গ্রন্থানুযায়ী প্রবন্ধ দুইটি বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত। প্রবন্ধদ্বয়ের

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পাঠ হইতে যে-সকল অংশ উক্ত গ্রন্থে বর্জিত তাহাই বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হইল।

'আত্মশক্তি'র অন্তর্গত 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' (প্রথমে 'হিন্দুত্ব' নামে ১৩০৮ শ্রাবণ -সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) প্রবন্ধের একটি অংশ, যৎ-সামান্য পরিবর্তনে, পরে ' 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' রচনায় যুক্ত হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থেও তদনুরূপ মুদ্রিত (পৃ ৪০-৪৩, + + চিহ্নে সীমাবদ্ধ অংশ)। ১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ সভায় পাঠ -কালে বাংলার মনীষীগণ এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন ১৩১১ ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী পত্রে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থে তাহারও সারসংকলন করা হইয়াছে।

শুধু আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই, তদনুযায়ী কলিকাতায় কাজ করিতেও তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন এইরূপ জানা যায়, যদিও কালক্রমে তাহার সকল চিহ্ন ও প্রমাণ লুপ্তপ্রায়। তবে, স্বদেশী সমাজের যে নিয়মাবলী রবীন্দ্রনাথ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার একটি মুদ্রিত সংবিধানপত্র শ্রীঅমল হোম মহাশয়ের যত্নে রক্ষা পাইয়াছে এবং বর্তমান গ্রন্থে সংকলন করা হইয়াছে। বন্ধুপত্নী অবলা বসুকে লিখিত সমকালীন পত্রেও (চিঠিপত্র ৬, পৃ ৯০-৯১) দেখা যায় যেমন মফস্বলে তেমনি কলিকাতাতেও এরূপ কাজের চেষ্টা হইয়াছিল— 'সুরেন্দ্রবাবুরা পল্লীসমাজ-গঠনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন— তাঁরা কলকাতায় ৯ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন— পল্লীগ্রামেও লাগবেন বলে আশা দিয়েছেন।'

পল্লীর ক্ষেত্রে এই স্বদেশী সমাজের বিশেষ যে রূপ রবীন্দ্রনাথের পরি-কল্পনায় ছিল তাহা অংশতঃ ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার অপর একটি রচনায়

—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'কংগ্রেস' পুস্তক হইতে এই রচনাটি পূর্বে 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে সংকলন করা হইলেও, প্রসঙ্গানুরোধে এ স্থলে পুনর্মুদ্রিত হইল। নিজের জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠনকার্যের যে আয়োজন করিয়াছিলেন, উক্ত 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থেই তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

দেশে জলকষ্টের প্রসঙ্গ লইয়া 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের সূচনা। পর বৎসর (১৩১২ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রে 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা' এই ছদ্মনামে 'জলকষ্ট' নামে একটি প্রবন্ধেও এ বিষয় আলোচিত হয়; আষাঢ় সংখ্যায় 'অহেতুক জলকষ্ট' নামে, 'শ্রীমতী মধ্যমা' এই ছদ্মস্বাক্ষরে, এই প্রবন্ধের আলোচনা প্রকাশিত হয়। প্রাসঙ্গিকবোধে সেই রচনা-দুইটি এই গ্রন্থে সংকলিত হইল। রচনা-দুইটি রবীন্দ্রনাথের, এইরূপ অনুমান হয়। আলোচনার পদ্ধতি হইতে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ১৩০৫ ভাদ্রের ভারতী পত্রে প্রকাশিত 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে' ও তাহার আলোচনা 'অপর পক্ষের কথা' (১৩০৫ আশ্বিন) প্রবন্ধের কথা অনেকের স্মরণ হইবে— প্রথম প্রকাশের সময় রচনা-দুটিতে কোনো স্বাক্ষর ছিল না; 'ভাদ্র মাসের ভারতীতে মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে প্রবন্ধের লেখক বাঁড়ুজ্জেমশায়দের হইয়া যে ওকালতি করিয়াছেন তাহা পক্ষপাতবিহীন নহে'— দ্বিতীয় প্রবন্ধের সূচনায় এই মন্তব্য হইতে এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এটি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির রচনা; বার্ষিক সূচীতে দুইটিই সম্পাদকের রচনা বলিয়া চিহ্নিত।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে 'সমাজপতি' নিয়োগের প্রস্তাব করেন, পরিশিষ্টের ১২ এবং ১৪ অঙ্কে চিহ্নিত সংকলনে (পৃ ১০৯-১১০,

১১০-১১৬) সে প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, স্বদেশী আন্দোলনের কোনো-এক পর্বে যখন দেশে মতানৈক্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে (১৫ বৈশাখ ১৩১৩ তারিখে পশুপতিনাথ বসুর সৌধপ্রাঙ্গণে আহূত মহাসভায় পঠিত) রবীন্দ্রনাথ 'দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায়'-রূপে 'কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার' করিবার প্রস্তাব করেন, এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য' সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করেন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য দশমখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬৫৩-৫৫। দেশের অনুরূপ অবস্থায় (১৯৩৯) রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে 'বাংলাদেশের অধিনেতা'-রূপে বরণ করেন—কালান্তর গ্রন্থে মাঘ ১৩৬৭ সংস্করণ হইতে এই দ্বিতীয় 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে।

বর্তমান গ্রন্থের 'সঞ্চয়ন' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ের নানা রচনা হইতে কালানুক্রমিকভাবে উদ্ধৃতি সংকলন করা হইয়াছে—ইহাতে, 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, রবীন্দ্র-চিন্তাধারায় তাহারই পূর্বাপর অনুস্থতি সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয়।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত রচনাবলীর প্রথম প্রকাশ-কাল যতদূর জানা যায়, তাহার একটি তালিকা* দেওয়া গেল।—

মর্মকথা। অংশ : 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'। প্রবাসী ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ
স্বদেশী সমাজ। বঙ্গদর্শন ১৩১১ ভাদ্র

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। বঙ্গবাসী। বঙ্গদর্শন ১৩১১ আশ্বিন
'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ-পাঠ। 'রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ ও তৎসংক্রান্ত সভা-
দ্বয়ের বিবরণী' শিরোনামে মুদ্রিত। ভারতী ১৩১১ ভাদ্র
স্বদেশী সমাজ: সংবিধান। মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্র। কাল অজ্ঞাত
সংগ্রাহক: শ্রীঅমল হোম
পল্লীসমাজ: সংবিধান। কাল অজ্ঞাত
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -প্রণীত 'কংগ্রেস' (দ্বিতীয় সংস্করণ)
জলকষ্ট। শ্রীমতী কনিষ্ঠার ছদ্মনামে মুদ্রিত। ভাণ্ডার ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ
অহেতুক জলকষ্ট। শ্রীমতী মধ্যমার ছদ্মনামে। ভাণ্ডার ১৩১২ আষাঢ়

সঞ্চয়ন: প্রত্যেক রচনাটি আংশিক সংকলন মাত্র।
১ ন্যাশনাল ফণ্ড্। ভারতী ১২৯০ কার্তিক
২ হাতে কলমে। ভারতী ১২৯১ আশ্বিন
৩ নব্যবঙ্গের আন্দোলন। ভারতী ও বালক ১২৯৬ আশ্বিন
৪ মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে। ভারতী ১৩০৫ ভাদ্র
৫ অত্যুক্তি। বঙ্গদর্শন ১৩০৯ কার্তিক
৬ বঙ্গবিভাগ। বঙ্গদর্শন ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ
৭ সফলতার সদুপায়। বঙ্গদর্শন ১৩১১ চৈত্র

---

* 'মর্মকথা' এবং 'সঞ্চয়ন' বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে আংশিক উদ্‌ধৃতি মাত্র তাহা তালিকাতেই বলা হইয়াছে। 'স্বদেশী সমাজ' এবং ''স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট'— সমূহ গ্রন্থে সংকলনকালে বঙ্গদর্শন পত্রের যে যে অংশ পরিত্যক্ত হয় বর্তমান গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' প্রধানতঃ তাহারই সংকলন। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ-পাঠ— ভারতী পত্রে প্রকাশিত নিবন্ধের সার-সংকলন এ কথা গ্রন্থপরিচয়ে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

৮ বিজয়াসম্মিলন। বঙ্গদর্শন ১৩১২ কার্তিক
৯ ব্যাধি ও প্রতিকার। প্রবাসী ১৩১৪ শ্রাবণ
১০ সত্যের আহ্বান। প্রবাসী ১৩২৮ কার্তিক
১১ ঢাকা ম্যুনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনের উত্তরে। প্রবাসী ১৩৩২ চৈত্র
১২ স্বরাজসাধন। সবুজ পত্র ১৩৩২ আশ্বিন
১৩ 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'। প্রবাসী ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ

পরিশিষ্ট। বঙ্গদর্শন ১৩১১ ভাদ্র, আশ্বিন

—